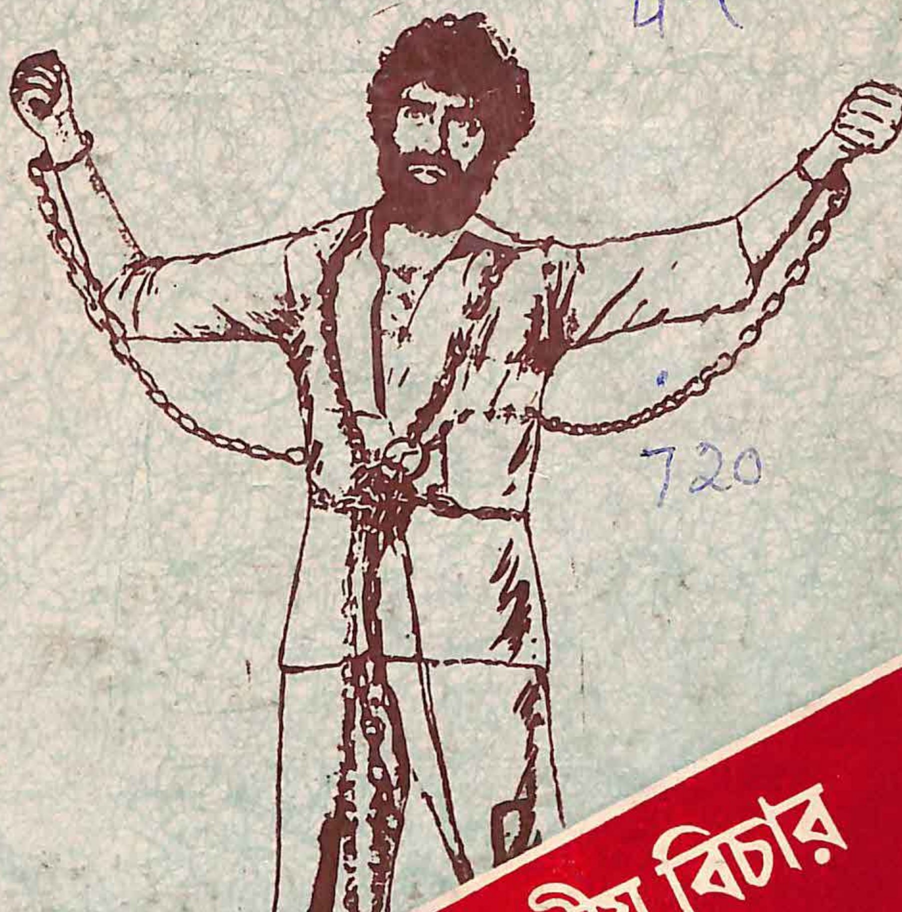


বরণীয় মানুষ ঃ স্মরণীয় বিচার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বরণীয় মানুষ ঃ স্মরণীয় বিচার

ভারতী পরিষদ ও [illegible] [illegible]

বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার

স্নীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—আষাঢ়, ১৩৯১
—জুন, ১৯৮৪

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—আষাঢ়, ১৩৯৩
—জুন, ১৯৮৬

প্রকাশক :
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ১৫ টাকা

মা-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

দুই নারী
সোনালি দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীর গোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
রক্তমাংস
শ্রেষ্ঠ কবিতা
আকাশ-দস্যু
তাজমহলে এককাপ চা

সূচীপত্র

সক্রেটিস	১১
খ্রীষ্ট	২২
নির্বাসনে দান্তে	৩৭
জোন অব আর্কের বিচার	৪৫
ক্রিস্টোফার কলাম্বাস	৫৪
দুঃসাহসী ব্রুনো	৬৫
গ্যালিলিও	৭৩
ওয়াল্টার র‍্যালের বিচার ও মৃত্যু	৮২
মৃত্যু থেকে ফিরে অমর ডস্টয়েভস্কি	৯৩
বায়রণ	১০৭
পল গগ্যাঁ	১২১
অস্কার ওয়াইল্ডের অকালমৃত্যু	১৩২

লেখকের কথা

যে-কজন আসামীর জীবন ও বিচারকাহিনী এখানে লেখা হয়েছে, তাঁরা সকলেই মানব সমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন চিন্তার প্রবর্তক তাঁদের অনেককেই সমকালের বিচারে লাঞ্ছিত হতে হয়। যাঁদের চিন্তা বা কীর্তির জন্য মানব সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যায় জীবিতকালে তাঁদেরই কারুর কারুর ভাগ্যে জোটে তিরস্কার, কারাবাস এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত।

এই সব অসম সাহসী ও মহান মানুষের জীবন বারবার প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে মানুষের অবিষ্কারের কোনো সীমা নেই। হৃদয় ও বহির্জগতে মানুষ চিরকালের অভিযাত্রী। যে-কোনো প্রকারে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় বাধা দিলে সমগ্রভাবে মনুষ্য সমাজেরই ক্ষতি হতে পারে। অতীতের এই সব কাহিনী হয়তো আমাদের ভবিষ্যতের পথ চেনাতে সাহায্য করতে পারে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সক্রেটিস

সত্তর বছর বয়সে আথেন্সের সক্রেটিসকে বিচারকদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনটি। দেশের প্রচলিত দেবতাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, নতুন নতুন দেবতার প্রবর্তন করার চেষ্টা এবং তৃতীয়টিই মারাত্মক,—তিনি যুবকদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করে তাদের বিপথে চালিত করছেন। আথেন্সের তিনজন খ্যাতিমান পুরুষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। সে এক বিচিত্র বিচার কাহিনী। পাঁচশো জন জুরীর সামনে বিচার। ষাট ভোটের ব্যবধানে সক্রেটিস অপরাধী হিসাবে নির্দেশিত হয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ড হয় নি। তখনকার দিনে আথেন্সের বিচার ব্যবস্থায় একটু বিশেষত্ব ছিল। অপরাধ সাব্যস্ত হবার পর অপরাধীকে জিজ্ঞেস করা হত যে, সে কী শাস্তি চায়। সক্রেটিসকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি কী শাস্তি চাও?

এর উত্তরে যদি তিনি বলতেন, 'নির্বাসন'—তবে নিশ্চিত তাঁকে ঐ শাস্তিই দেওয়া হত। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ—তাতে তাঁর দেশত্যাগেই বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রোশ নিবৃত্ত হত। কিন্তু সক্রেটিস নিজেকে অপরাধী মনে করতেন না। সুতরাং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁকে জনসাধারণের পয়সায় পাবলিক হলে ভোজ দেওয়া হোক!

এই উত্তরে জুরীরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁরা মনে করলেন, সক্রেটিস এই বিচারকে প্রহসন মনে করছে এবং তাঁদের উপস্থিতির সম্মান দিচ্ছে না। ফলে উচ্চারিত হল, মৃত্যুদণ্ড। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে জুরী ছিলেন ২৮০ জন এবং স্বপক্ষে ২২০ জন। তাঁর ঐ উত্তর শুনে হয়ে গেল বিরুদ্ধে ৩৩০ জন!

বিচার নিয়ে তিনি আরও ঠাট্টা করেছিলেন। দণ্ডাজ্ঞার পর তাঁর ভগ্নমনোরথ বন্ধু ও শিষ্যবৃন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁকে যেন জেলে আটকে না রেখে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন এ প্রথাও ছিল। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়া হত আথেন্সের অদূরবর্তী এক দ্বীপের দেবীর কাছে। সেখান থেকে নৌকা ফিরে এলে শাস্তি কার্যকর হত। সক্রেটিস জামিন হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন এক দীনা (রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ)। তাঁর বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগত দায়িত্বে তিরিশ দীনা দিতে চাইলেন—কিন্তু সে প্রার্থনা না-মঞ্জুর হয়েছিল। বিচারের প্রায় এক মাস পর মৃত্যু হয় সক্রেটিসের—

এই সময়ে তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন।

সক্রেটিসের মত মৃত্যু সম্বন্ধে এমন উদাসীনতা বোধ হয় আর কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় নি। যীশুখ্রীষ্টও মৃত্যুদণ্ডকে চরম শান্ত এবং ধৈর্যশীল হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন তিনদিন পর তাঁর পুনর্জীবন হবে এবং স্বর্গের পুত্র স্বর্গে ফিরে যাবেন। সক্রেটিস কায়িক মৃত্যুকে অমোঘ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন আত্মার অমরত্বে। বিচারকদের উদ্দেশ করে তাঁর শেষ কথা ছিল এই : "আমি চলেছি মৃত্যুর দিকে, আপনারা যান জীবনের দিকে। ঈশ্বর জানেন কোন দিকটা শ্রেষ্ঠ।"—যখন তাঁর মৃত্যুদিনের বর্ণনা পড়বো তখন দেখা যাবে—মৃত্যুকে তিনি কত অকিঞ্চিৎকর মনে করেছেন।

সক্রেটিসের সময়, অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের সাড়ে চার শো বছর আগে, গ্রীস দেশ ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করা। সেই যুগ ছিল মানুষের জ্ঞান এবং অধিকার প্রসারের যুগ। নতুন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব এবং তাই নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ। এবং দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ এবং ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধ বিগ্রহ এবং খুনোখুনি তখন এমন মারাত্মক এবং দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে উঠেছিল যে অ্যারিস্টোফিনিসের একটি নাটকে দেখা যায়, গ্রীসের স্ত্রীলোকেরা একটা সংঘ স্থাপন করে ঘোষণা করেছে—যদি তাদের স্বামীরা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ না করে তবে তাদের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক থাকবে না—তাদের কোনো ইচ্ছায় প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আথেন্স খুব ছোট দেশ—জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ—সক্ষম বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা তার মধ্যে চল্লিশ হাজার। এবং এই আথেন্সই একদিন শৌর্য এবং জ্ঞানে প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক দেশ আথেন্স।

দার্শনিক বললেই যে চরিত্র আমাদের চোখে ভেসে ওঠে অর্থাৎ কর্মে নিস্পৃহ, জ্ঞান-সমুদ্রে সর্বদা মগ্ন, তার সঙ্গে সক্রেটিসের কোন মিল নেই। 'তাঁর শরীর ছিল অত্যন্ত সবল। তাঁর শরীর ও মন উভয়ই ছিল ইস্পাতের মত' প্লেটো বলেছেন। এক দরিদ্র কারিগরের ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। শৈশবে সর্ববিদ্যা শিক্ষা করেন—তার মধ্যে জ্যোতিষ ও জ্যামিতিও বাদ ছিল না। যৌবনে তিনি সৈনিক হয়েছিলেন। দার্শনিক হলেই তাঁকে ব্যবহারিক কাজে অক্ষম হতে হবে, এ-কথা তিনি প্রমাণ করেন নি। তিনবার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর ধৈর্য এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল প্রচণ্ড। একবার তিনি নগ্নগাত্রে গ্রীসের প্রচণ্ড শীতে স্বেচ্ছায় প্রান্তরের মধ্যে একা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন!

পরে তিনি সৈনিকবৃত্তি ত্যাগ করে আথেন্স শহরে স্থায়িভাবে বাস করেন। সারাজীবন কাটিয়েছেন দারিদ্র্যের মধ্যে। তিনি কোন বই বা বড় বড় উপদেশ লিখে রেখে যান নি। অতি সাধারণ বিষয়ে—যেমন শিশু পালন, রোগীর সেবা, পিতামাতার কর্তব্য, কোন আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী—এ সব প্রসঙ্গেই তিনি কথা বলতেন। তিনি ঘোষণা করতেন ঃ যে-মানুষ সৎ, ইহলোক বা পরলোকে তার কখনো কোন ক্ষতি হতে পারে না।

তাঁর মত তিনি ব্যক্ত করতেন কোন সভায় বা বক্তৃতায় নয়, নিতান্তই কথোপকথনের সময়ে অর্থাৎ আড্ডায়। আড্ডা দিতে বড় ভালবাসতেন তিনি। বাজারে, টাকা ধার করতে গিয়ে মহাজনের দোকানে, বন্ধুদের বাড়িতে বা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি নিজে কিছু লিখে যান নি। তাঁর বন্ধু বা শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্লেটো,—আবার প্লেটোর বিখ্যাত শিষ্য আরিস্টটল। এঁদের মধ্যে দিয়েই সক্রেটিস বেঁচে আছেন।

সক্রেটিসের স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছিল। স্ত্রীর নাম ছিল জ্যানথিপি,—এঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এঁর মেজাজ ছিল ভয়ানক চড়া, এই জন্য ইংরেজিতে জ্যানথিপি কথার মানেই হল ক্রোধপরায়ণা মহিলা। স্বামীর এত আড্ডাপ্রিয়তা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। একবার রাগের চোটে তিনি একটা লম্বা আখ দিয়ে স্বামীকে এমন পিটিয়েছিলেন যে, আখটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এতে বিরক্ত হবার বদলে সক্রেটিস আরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং ইক্ষুখণ্ডগুলি দেখে এই দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করেন যে, যা এক ছিল তাই-ই বহু হল!

আর একবার স্ত্রীর বাক্যবাণ সহ্য করতে না পেরে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন—কিন্তু বেশী দূর না গিয়ে চৌকাঠে বসে পড়েই বই পড়ায় মগ্ন হয়ে যান। তখন জ্যানথিপি ওপর থেকে এক গামলা ময়লা জল ঢেলে দেন স্বামীর মাথায়। তাতে সক্রেটিস মৃদু হাস্যে বলেছিলেন, এত গর্জনের পর এক পশলা বৃষ্টি না হলে মানাতো না, প্রিয়ে! অবশ্য প্লেটোর বর্ণনায় সক্রেটিসের স্ত্রীর এমন কোন চরিত্র ফুটে ওঠে নি। সেখানে তিনি একজন সাধারণ, স্নেহশীলা সংসার-প্রিয় মহিলা—খুবই স্বাভাবিক যিনি পতির বিরাটত্ব সব সময় উপলব্ধি করতে পারেন নি। অন্তত টলস্টয়ের পত্নীর মতো সক্রেটিস মৃত্যুকালে স্ত্রীকে দেখে মূর্ছা যান নি।

সক্রেটিসকে অভিযুক্ত করার কারণ ছিল বেশ কয়েকটি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে আথেন্স তিরিশজন স্বৈরাচারীর অধীনে ছিল। সক্রেটিসও এঁদের দ্বারা

উৎপীড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু সক্রেটিস ক্রোধশূন্য ছিলেন বলে—এঁদের মধ্যে তিনজনের সঙ্গে তাঁর আগে থেকে যে বন্ধুত্ব ছিল তা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এটা গণতন্ত্রের সমর্থকদের সহ্য হয়নি—যদিও সক্রেটিস নিজেও গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি ভোট দিয়ে দেশের সমস্ত পদের নির্বাচন করা পছন্দ করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, রোগ চিকিৎসার ভার যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে দেওয়া উচিত তেমনি দেশ শাসনের ভারও দেওয়া উচিত অভিজ্ঞ রাজনীতিকের কাছে।

অনেকের ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল সক্রেটিসের উপর। অনেকের জ্ঞানের অহঙ্কার সক্রেটিসের কাছে চূর্ণ হয়েছিল। সক্রেটিস প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতেন, "আমার কোন জ্ঞান নেই।"—'কিছুই জানি না আমি এই মাত্র জানি।' কিন্তু তিনি দেশের বিখ্যাত জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি পরীক্ষা করতেন। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসের যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে সেই সমস্ত প্রাজ্ঞমানীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন খুব। কেউ কেউ আদর্শগতভাবেই সক্রেটিসের নতুন চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসের বক্তব্য ছিল—যে কোন চিন্তা বা কাজকেই যুক্তি দ্বারা বিচার করা উচিত। Think deeper—এই ছিল সক্রেটিসের প্রধানতম বাণী।

অভিযোগকারী তিনজনের নাম ছিল Meletas, Lycon এবং Anytus. প্রথমজন একজন মধ্যম শ্রেণীর কবি, দ্বিতীয়জন বক্তা এবং তৃতীয়জন গণতান্ত্রিক নেতা। অ্যানীটাসকে এক সময় সক্রেটিস বলেছিলেন যে, সে যেন তার ছেলেকে তখনই সৈনিকবৃত্তিতে নিয়োগ না করিয়ে আরও কিছু লেখাপড়া শেখায়। অ্যানীটাস তা শোনেন নি, ফলে কিছুদিন পরে যখন ছেলেটা মাতাল এবং দুশ্চরিত্র হয়ে যায় তখন তিনি সক্রেটিসের ওপরই আরও চটে যান। তাহলেও অ্যানীটাসের সৎলোক হিসাবে সুনাম ছিল—তিনি সক্রেটিসের আদর্শকে মন থেকেই অপছন্দ করতেন।

সে সময়ে বিচার সভায় কোন উকিল বা আইনজীবী থাকতো না। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করতেন। বিচার সভায় প্রথমে ঐ তিনজন তাঁদের অভিযোগের বর্ণনা করেন—তারপর সক্রেটিস উঠে দাঁড়িয়ে বলেন নিজের কথা। অভিযোগকারীদের বক্তৃতা কোথাও লিখিত নেই—সুতরাং তাঁদের বক্তব্য সম্পূর্ণ জানা যায় না। সক্রেটিসের দীর্ঘ জবানবন্দী দুজন লিখে রেখেছিলেন—প্লেটো এবং জেনোফেন। দুজনে দু-রকম ভাবে সক্রেটিসকে দেখেছেন—তবে প্লেটোর বর্ণনাই পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন এবং

এই রচনা পৃথিবীর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম বিরলসার্থক রচনা। প্লেটোর এই রচনার ইংরিজি অনুবাদের নাম অ্যাপোলজি। অ্যাপোলজির কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা হল :

"হে আথেন্সের অধিবাসিবৃন্দ, আমার অভিযোগকারীদের বক্তৃতা আপনাদের কেমন লেগেছে তা আমি জানি না, কিন্তু তাঁদের বাক্-কুশলতায় আমি নিজেকেই বিস্মৃত হয়েছিলাম, -যদিও তাঁরা একটিও সত্য বলেন নি। তাঁদের অনেক মিথ্যে কথার মধ্যে বিশেষতঃ একটি শুনে আমি বিষম চমকে উঠেছি, যখন তাঁরা আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনারা যেন আমার বাগ্মিতার দ্বারা প্রতারিত না হন। তাঁদের একথাটা আমার কাছে চরম·নির্লজ্জ মনে হয়েছে। কারণ আমি মুখ খুললেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমার অন্য আর যে গুণই থাক, ঐ গুণটি নেই। অবশ্য বাগ্মিতার জোর বলতে যদি তাঁরা সত্যের জোর বুঝিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমি একজন বক্তা। আমি নিজে আমার যুক্তির সততায় দৃঢ় বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি ওঁদের মত অমন অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে পারবো না, যুবকদের মত শব্দের খেলা দেখাতে পারবো না। আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এইটুকু দয়া করবেন যে, যদি আমি আমার প্রতি অভিযোগ অস্বীকারে সাধারণ ভাষা ব্যবহার করি, যে-ভাষায় আমি বাজারে কিংবা মহাজনের টেবিলে এবং অন্যত্র কথা বলি, তবে বিস্মিত হবেন না বা আমাকে বাধা দেবেন না। আমার বয়স সত্তরের বেশী এবং জীবনে এই প্রথম আমি আদালতে এসেছি।···আমি এখানকার ভাষা জানি না ; বক্তাকে তার সত্য প্রকাশ করতে দেওয়া হোক, এবং বিচারকরা সত্য বিচার করুক।

এর আগেও আমি বহুবার অভিযুক্ত হয়েছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেরই যখন জন্ম হয় নি বা নিতান্ত শৈশব—তখন থেকেই। তাঁরা বলেছেন সক্রেটিস নামে একজন মানুষের কথা, যে নাকি স্বর্গের অনুসন্ধান করে, পৃথিবীর বিচার করে এবং কু-যুক্তিকেই সুযুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাঁদের এই রটনাই আপনারা শুনেছেন, আমার কাছ থেকে কোন উত্তর চান নি। সেই সব নিন্দুকদের নাম আমার মনে নেই, বলতেও পারবো না।—তবে সেই হাস্য-রসের কবির (অ্যারিস্টোফিনিস) কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমি ঈশ্বর ও আইনের প্রতি আনুগত্য রেখে আত্মপক্ষ সমর্থন করবো।

এঁরা সকলেই এবং কবি অ্যারিস্টোফিনিস বলেন এমন একজন সক্রেটিসের কথা—যে একজন অন্যায়কারী, যে বাতাসে হাঁটে এবং এমন সব বিষয়ে কথা

বলে, যে বিষয়ে আমি খুব বেশী বা অল্প কিছুই জানি না (অ্যারিস্টোফিনিস তাঁর 'ক্লাউড' নাটকে সক্রেটিসের একটি ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, সক্রেটিস বাতাসের উপর দিয়ে হাঁটে এবং মেঘ ও পবনের পুজো করে। সে 'ভাবনার দোকান' নামে এমন এক দোকানের মালিক যেখান থেকে ছাত্ররা পদার্থবিদ্যা বা জীববিদ্যা সম্পর্কে ধাঁধা কিনতে আসে।) কিন্তু সহজ সত্য হল এই, হে আথেনীয়গণ পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে আমার কোনরূপ অনুসন্ধান নেই। যাঁরা আমাকে কথা বলতে শুনেছেন তাঁরা বা তাঁদের প্রতিবেশীরা বলুন আমি কি কখনও এসব কথা বলেছি ?

(জনতার মধ্য থেকে 'না' 'না' এই ধ্বনি উঠলো)

এ তথ্যও ভুল যে আমি একজন শিক্ষক এবং এ জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করি। যদিও একথা আমি বিশ্বাস করি যে জ্ঞান বিতরণের বিনিময়ে যদি কারুকে অর্থ দেওয়া হয়, তবে তাঁকে সম্মান দেখানোই হয়,···কিন্তু আমার সে রকম যোগ্যতা নেই। থাকলে আমি সৌভাগ্যবান হতাম।

হে আথেনীয়গণ, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বলবেন, তবে তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ কি ? তুমি যদি অন্য সকলের মতো হতে তবে তোমার সম্বন্ধে এত সব কথা উঠছে কেন ? এর উত্তর আমি দেব। শুনে হয়তো আপনারা ভাববেন যে আমি পরিহাস করছি। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সত্য ভাষণ করবো। হে আথেন্সের অধিবাসীবৃন্দ, আমার এরকম সম্মানের কারণ আমার এক বিশেষ জ্ঞান—তবে আমি বলবো—সেই জ্ঞান যা আমার মতে সব মানুষের মধ্যে বর্তমান। আমি এইটুকু মাত্র জ্ঞানী। কিন্তু আমার অভিযোগকারীরা প্রচণ্ড জ্ঞানী—যা আমার নেই বলে বর্ণনাও করতে পারবো না। যাঁরা আমাকে এর চেয়েও বেশী জ্ঞানী বলেন তাঁরা মিথ্যে বলেন এবং আমার চরিত্র বিকৃত করেন।

এখানে আমি একজন সাক্ষীর কথা উল্লেখ করবো। যদি আপনাদের কাছে অবান্তর বা হাস্যকর মনে হয় তবুও আমাকে বাধা দেবেন না,—সেই সাক্ষী হল ডেলফির দেবতা।

আপনারা আমার বন্ধু চেরেফোনকে চেনেন—কারণ সে আপনাদেরও বন্ধু এবং দেশপ্রেমিক। চেরেফোন মারা গেছে—তার ভাই এই আদালতে উপস্থিত আছে, সে সত্যতার সম্বন্ধে সাক্ষী দেবে।

চেরেফোনকে আপনারা জানেন, সে ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। সে ডেলফিতে গিয়ে দেবতা অ্যাপোলোর সামনে সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল,

সে জিজ্ঞেস করেছিল, সে···আমি নিজের মুখেই বলছি, দয়া করে বাধা দেবেন না, সে জিজ্ঞেস করেছিল যে, আমার চেয়েও (অর্থাৎ সক্রেটিসের) আর কেউ বেশী জ্ঞানী আছে কি না। সেই দেবতা উত্তর দিয়েছিলেন, না, আর কেউ নেই।

এ কথার কেন উল্লেখ করলাম? আপনাদের কাছে আমার অপবাদের কারণ বর্ণনা করতে হল।

ঐ দৈববাণী শোনার পর থেকেই আমি ভেবেছি যে, ওর অর্থ কি? আমি তো জানি যে আমার কোন জ্ঞানই নেই, তবে কেন দেবতা ও কথা বললেন। এবং দেবতা তো মিথ্যে বলবেন না। তখন আমি ঠিক করলাম যে যদি আমার চেয়ে জ্ঞানী লোককে খুঁজে বার করতে পারি তা হলেই দেবতার কাছে গিয়ে বলবো, এই দেখুন হে দেবতা, আমার চেয়েও একজন জ্ঞানী লোক আছে!

এই ঠিক করে আমি একজনকে পরীক্ষা করতে গেলাম। তাঁর নাম বলবো না, তিনি একজন জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি এ কথা না ভেবে পারলাম না যে তিনি সত্যিই জ্ঞানী নন, যদিও অনেক লোক এবং তিনি নিজেও নিজেকে খুব জ্ঞানী বলে ভাবেন। এর ফল কী হল? সেই লোকটি এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব আমার শত্রু হয়ে গেল। আসার সময় বলে এলাম, আপনি বা আমি কেউ জ্ঞানী নই। আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান শুধু এই মাত্র বেশী যে আমি জানি আমি কিছুই জানি না —কিন্তু এ জ্ঞানটুকুও আপনার নেই।

তারপর আমি আর একজনের কাছে গেলাম—যার জ্ঞানের অভিমান আরও বেশী ছিল। কিন্তু একই ফল পেলাম।

আমি একের পর আর একজনের কাছে যেতে লাগলাম—ক্রমশঃ আমার শত্রু সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, সেই দৈববাণীর সত্যতা নিরূপণ করতে হবে। রাজনীতিজ্ঞদের শেষ করে আমি কবিদের কাছে গেলাম। তাঁরা নিজেদের রচনারই অর্থ করে দিতে পারেন না। তখনই বুঝেছিলাম কবিরা জ্ঞানের সাহায্যে লেখেন না, তাঁরা লেখেন প্রেরণায় বা তাঁদের অন্তরে যে ঈশ্বর থাকেন—তাঁর সাহায্যে। কিন্তু নিজেদের রচনার বলে তাঁদের মধ্যে অত্যধিক জ্ঞানের অহঙ্কার জন্মায়। আমি দেখলাম, যাঁরা বেশী খ্যাতিমান তাঁরাই সবচেয়ে অল্প জানেন।

শেষ পর্যন্ত আমি গেলাম শিল্পী এবং শ্রমিকদের কাছে। কারণ আমার জ্ঞানহীনতা সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম এবং আমার ধারণা ছিল ওঁরা আমার

চেয়ে অনেক বেশী জানেন। সত্যিই তাই। আমি এমন অনেক বিষয় জানি না, যা ওঁদের জানা। কিন্তু কবিদের মত ওঁদেরও সেই দোষ। নিজে হয়তো ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পারেন—কিন্তু অন্য বহু প্রসঙ্গে তাঁরা মূর্খ—এই দোষ তাঁদের কৃতিত্বকে ঢেকে দেয়।

এই অনুসন্ধানের ফলে আমার শত্রু সংখ্যা অগণিত হল—অনেক সময় আমার জীবনও বিপন্ন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি দৈববাণীর অর্থ বুঝতে পারলাম। হে আথেনীয়গণ, সেই দৈববাণী এই কথাই বুঝিয়েছে যে, মানুষের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। আমার নাম একটি উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ দৈববাণী বলেছে, সে-ই জ্ঞানী, যে সক্রেটিসের মত জানে যে তার জ্ঞান মূল্যহীন।

আমার কাছে অনেক ধনী সন্তান স্বেচ্ছায় সময় কাটাতে আসতো। অনেক সময় তারা আমাকে অনুকরণ করতো এবং অন্যান্য লোকের জ্ঞান পরীক্ষা করতো। এতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তখন তাঁরা সেই যুবকদের উপর ক্রুদ্ধ না হয়ে আমার উপর ক্রুদ্ধ হতেন। এবং বলতেন, এই সেই দুর্মতি সক্রেটিস, যে যুবকদের আত্মা বিষাক্ত করছে। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সক্রেটিস কোন আদর্শ প্রচার করে? কোন উত্তর নেই, তাঁরা জানেন না। কিন্তু নিজেরা মূর্খ না সাজবার জন্য তাঁরা সক্রেটিসকে শাস্তি দিতে চান। অন্যান্য বহু সৎলোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে —দেবতা মানে না, অপপ্রচার করে—আমার বিরুদ্ধেও সেই পুরানো অভিযোগ। আমার মূল অভিযোগকারী তিনজন—কবিদের পক্ষ থেকে মিলেটাস্, শিল্পী এবং রাজনৈতিকদের পক্ষ থেকে অ্যানীটাস এবং লাইকন— এঁদের সঙ্গেও আমার বিসংবাদ হয়েছিল।

আমি সমস্ত খুলে বললাম, কিছুই গোপন করি নি। হয়তো আমার বক্তব্যের সরলতায় অভিযোগকারীদের আরও ঘৃণা জন্মাবে। কিন্তু সত্য প্রকাশিত হবেই। এদিকে এসো মিলেটাস, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করবো। যুবকদের উন্নতির জন্য তুমি খুব চিন্তিত, না?

—হ্যাঁ।

—তবে এই জুরীদের বলো যে, যুবকদের সুপথ-চালক কে? তুমি যখন যুবকদের বিপথ চালককে খুঁজে পেয়েছো তখন সুপথ চালককেও নিশ্চয়ই দেখেছো?…দেখো মিলেটাস্, তুমি চুপ করে আছো। তোমার বলার কিছুই নেই। এতে কি প্রমাণ করে না যে যুবকদের উন্নতির বিষয়ে তোমার কোন আগ্রহ নেই। বলো, কে যুবকদের সৎ নির্দেশক?

—আইন।

—না, সে কথা নয়, সেই মানুষটি কে—যে 'আইন' ব্যবহার করে।

—এখানে যে মাননীয় জুরীরা আছেন, তাঁরাই, সক্রেটিস।

—তুমি কি বলতে চাও মিলেটাস, এই জুরীরাই যুবকদের সৎপথ নির্দেশক।

—নিশ্চয়ই।

—একটা নতুন কথা শোনা গেল। তাহলে বহু সুপথ চালক আছেন দর্শকদের কি বলছো—এঁরা সকলেই সৎ-নির্দেশক?

—নিশ্চয়ই!

—আর সিনেটের সদস্যরা?

—হ্যাঁ, তাঁরাও।

—তাহলে বিধান পরিষদের সদস্যরা বোধহয় ওদের নষ্ট করেন। না কি, তাঁরাও উন্নতিকামী?

—তাঁরাও উন্নতিকামী।

—তবে আথেন্সের প্রত্যেকেই তাদের উন্নতি এবং সংশোধন করে। একমাত্র আমিই অপকারক। এই-ই তুমি বলতে চাও?

—আমি দৃঢ়ভাবে সে-কথাই ঘোষণা করতে চাই।

—তাহলে যুবকদের পরম সৌভাগ্য যে তাদের মাত্র একজন অপকারক এবং বাকি পৃথিবীর সকলেই উপকারক।...

একটু থেমে সক্রেটিস আবার শুরু করলেন,—আচ্ছা আমি আর একটি প্রশ্ন করবো। কু-নাগরিকের সঙ্গে বাস করা শ্রেয়ঃ না সু-নাগরিকের? মন্দ লোকেরা প্রতিবেশীদের মন্দ করে এবং সৎ লোকেরা করে উপকার, তাই না?

—নিশ্চয়ই!

—তবে কি এমন কেউ আছে যে সৎলোকের সঙ্গে না থেকে নিজে আহত হতে ইচ্ছে করে? বলো, সুবিচার তোমার উত্তর চায়। এমন কি কেউ আছে যে ইচ্ছে করে নষ্ট হতে আসে?

—না।

—এবং তুমি যখন আমাকে যুবকদের অপকারক হিসাবে অভিযোগ করছ—আমি কি ইচ্ছাতে করি না অনিচ্ছায়?

—ইচ্ছা করে।

—তুমি একটু আগে স্বীকার করেছো যে সৎলোকেরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৎব্যবহার করেন, মন্দলোকেরা মন্দ। আমি তাদের ক্ষতি করলে তারাও কি

আমার ক্ষতি করবে না!”

এর পর সক্রেটিস ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। যে স্বল্প-সংখ্যক জুরী তাঁকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। নিজের মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে কোন কথা না বলে, কোন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেবার সময় বিচারকের বিবেক আহত হয় কিনা সে কথা জিজ্ঞেস করলেন। কোন মানুষকে হত্যা করা—ঘুম থেকে উঠে একটা মাছি মেরে আবার ঘুমিয়ে পড়া নয়, মনে রাখবেন। সবশেষে উচ্চারণ করলেন সেই কথা—“আমি চলেছি মৃত্যুর দিকে, আপনারা যান জীবনের দিকে। ঈশ্বর জানেন কোন দিক শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরই জানেন।”

বিচারের পর একমাস তিনি জেলে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং বন্ধু-শিষ্যরা তাঁকে দেখতে আসতেন। এই সময়েই তিনি, জীবনে প্রথম, কয়েকটি কবিতা লেখেন। ঠিক দুদিন আগে স্বপ্নে তিনি মৃত্যুর ক্ষণটির কথা জানতে পারলেন। এই এক মাসের মধ্যে তাঁর শিষ্যরা একবার জেল ভেঙে তাঁর পালাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু সক্রেটিস রাজী হন নি। পৃথিবীর যে কোন দেশে গেলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, তিনি জানতেন। তা ছাড়া, যে-কোন নাগরিকেরই সেই দেশের আইন এবং শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত, এ কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে বললেন, তুমি যাও বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। অত্যন্ত শান্ত ও প্রফুল্ল ছিলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে বসে-ছিলেন তাঁর বান্ধব এবং শিষ্যমণ্ডলী। আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় তাঁরা অনেকেই কাতর হয়ে উঠেছিলেন। আত্মার অবিনাশত্ব সম্পর্কে অনেকের সংশয় ছিল! তখন তিনি দেহ এবং আত্মার সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন।

আলোচনার শেষে মৃত্যুর পর যেভাবে তাঁর কবর দেওয়া হবে সেইভাবে নিজের শরীর এবং বেশবাস প্রস্তুত করলেন। যাতে মৃত্যুর পর তাঁর শরীরে অন্য কেউ হাত না দেয়। তারপর বন্ধুদের কাছে অনুমতি নিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে আড়ালে কিছুক্ষণ কথা বললেন।

ঠিক রক্ত সূর্যাস্তের সময় কারাগার পরিচালক এসে তাঁর কাছে জানালেন শেষ বিদায়। সেই রাজকর্মচারীর দুই চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সে বলল ঃ সক্রেটিসই তার জীবনের সবচেয়ে ভদ্র, সবচেয়ে সাহসী এবং শ্রেষ্ঠ কয়েদী।—তারপর মৃত্যুদূতের মত হেমলকের পাত্র নিয়ে জল্লাদ প্রবেশ করল। এই হেমলক তীব্র বিষ, পা থেকে আরম্ভ করে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিয়ে সমস্ত

শরীরকে অসাড় করে এবং মৃত্যু ঘটায়। জল্লাদ বলল, হেমলকের এক ফোঁটাও যেন নষ্ট না হয়। না, এক ফোঁটাও নষ্ট হবে না, সক্রেটিস বললেন। তারপর কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন নীরবে। সেই ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের মন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। যেন প্রত্যেকেই মাথায় বিষম ভারী বোঝা বইছে—তার চাপে সকলেই চুপ—একমাত্র শান্ত ছিলেন সক্রেটিস।

প্রার্থনা সেরে পাত্রটি তুলে নিয়ে সেই বিষ সম্পূর্ণ পান করলেন। তাঁর মুখ একটুও বিকৃত হল না! সকলে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন, একজনের হিষ্টিরিয়ার মতো হল। সক্রেটিস নিজে তার কাছে এসে মাথা কোলের উপর তুলে ধরে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করলেন। তখন জল্লাদ বলল, কিছুক্ষণ সক্রেটিসকে উঠে ঘরে পায়চারি করতে হবে—না হলে বিষ সারা শরীরে ছড়াবে না। এই নিষ্ঠুর অনুরোধে ভক্তদের মন শিউরে উঠলো, যেন অসংখ্য না-না ধ্বনি জেগে ওঠে, কিন্তু ভাবান্তরহীন মুখ সক্রেটিসের, নিজের মৃত্যুর বদলেও জল্লাদের দায়িত্বে বাধা দিতে চান না। তিনি উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর পা অত্যন্ত ভারী এবং অসাড় হয়ে এল। তিনি শুয়ে পড়লেন এবং নিজেই মুখটা ঢাকা দিলেন। কিছুক্ষণ পর সব চুপ, মনে হল যেন পৃথিবী পর্যন্ত থেমে গেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। হঠাৎ সক্রেটিস মুখের ঢাকা সরিয়ে বললেন, "ক্রিটো, আমাদের একটা মুর্গি ধার আছে। অ্যাসক্লিপিয়াসের কাছে, ওকে মনে করে শোধ দিয়ে দিও।"

সেই শেষ। তখনি তাঁর মৃত্যু হয়। হয়তো মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের ঘটনাবলীর পুনর্বিচার করছিলেন।

যীশুখ্রীষ্ট

ক্ষমতা এবং সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে উঠেছিল যে রোম সাম্রাজ্য, দর্পে এবং ঐশ্বর্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। সেই রোমান সভ্যতা-বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল একজন শান্ত, সঙ্গীহীন মানুষ। ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন, রোমের পতনের কারণ যীশুখ্রীষ্ট। যদিও রোমান শাসক হত্যা করেছিল যীশুকে—নিতান্ত যুবা বয়সে, কিন্তু যীশুর রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে, জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সহনশক্তি। শেষ পর্যন্ত পশুশক্তির বিরুদ্ধে সহনশক্তিরই জয় হল।

যদিও যীশুর হত্যার জন্য রোমের শাসকবর্গই ঠিক দায়ী নয়। রোম সম্রাট যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। যীশুকে হত্যা করেছে তাঁরই স্বজাতির ক্রোধ, ইহুদী পুরোহিতদের ঈর্ষা। জেরুজালেমে তখন রোমের একজন গভর্নর ছিল—পনটিয়াস পাইলেট। তার কাছে ইহুদীরা যীশুকে নিয়ে আসে বিচারের জন্যে। পনটিয়াস যীশুকে হত্যা করার জোরালো কারণ খুঁজে পায় নি, সে অপেক্ষমান রক্ত-তৃষিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলো—তোমরা কি এই লোকটির মৃত্যুর পাপ ভোগ করবে? জিঘাংসু জনতা চীৎকার করে উঠেছিল, "His blood be on us and on our children"—ওর রক্তপাতের দায়িত্ব আমরা বংশপরম্পরায় ভোগ করবো।

ইহুদীরা এই পাপের শাস্তি বহু শতাব্দী ধরে ভোগ করেছে। অবশ্য যীশু ওদের ক্ষমা করতে বলেছিলেন!

সে সময় রোম সাম্রাজ্য, এমনকি সমস্ত পৃথিবীই অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত মানুষে পূর্ণ। জুলিয়াস সিজার রোমের গণতন্ত্র ভেঙে দিয়েছিলেন, সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকদের আমলে যা হয়, একদল বিষম দরিদ্র, একদল অযথা মাত্রাতিরিক্ত ধনী। সম্ভ্রান্ত রোমক সমাজে ধর্ম ছিল না, নীতি ছিল না, মহত্ত্ব ছিল না—শুধু লালসা, বিলাস, ব্যভিচার। সে সময় রমণীরা ইচ্ছে অনুসারে স্বামী বদল করতো, কুমারী অবস্থায় সন্তানবতী হওয়া ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। মদ, স্ত্রীলোক এবং কথায় কথায় যুদ্ধ ও রক্তপাত, এই তিন নেশায় ডুবে থাকাই ছিল স্বাভাবিক জীবন। জুলিয়াস সিজার থেকে তার সব কটি বংশধরই বিষম দুশ্চরিত্র। সম্রাট অগাস্টাসের তিনটি স্ত্রী ছিল এবং সেই সঙ্গে বহু উপপত্নী। কিন্তু তার সন্তান হয়েছিল মাত্র একটি। মেয়ে

জুলিয়া। ব্যভিচারের জন্য জুলিয়া ইতিহাসবিখ্যাত। জুলিয়ার মেয়ে ছিল মায়ের চেয়েও কীর্তিমতী। বৃদ্ধ বয়সে অগাস্টাস বিলাপ করে বলেছিলেন, 'আঃ, আমি যদি বিয়ে না করতাম, কিংবা আমার কোন সন্তান যদি না থাকতো তবে হয়তো একটু শান্তি পেতাম।'

ইহুদীরা সে সময় ছিল চরম নির্যাতন এবং নিষ্পেষণে; কারণ তারা বিশ্বাস করতো ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। প্রথমত ঈশ্বর নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাই এক বিড়ম্বনা—তাছাড়া রোমান বিশ্বাসের বিরোধিতা—সুতরাং অকারণে ইহুদী হত্যা ছিল রোমানদের অন্যতম বিলাস। তবু সেই দুর্দিনের অন্ধকারে ইহুদীদের একমাত্র আশা ছিল যে তাদের মধ্যে একজন পরিত্রাতা (মেসায়া) আসবেন যিনি তাদের সমস্ত অপমান এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন সত্যিই সেই পরিত্রাতা এলেন—তখন ইহুদীরা তাঁকে চিনতে পারলো না—তারা নিজেরাই তাকে হত্যা করলো।

প্রথমে ইহুদীরা ভেবেছিল জন দি ব্যাপটিস্টই তাদের পরিত্রাতা। সাধু জন নিজে বললেন, না, তিনি ত্রাণকর্তা নন, সত্যকার ত্রাণকর্তা শীঘ্রই আসবেন। জুডিয়ার মরুভূমিতে এক গুহায় বাস করতেন জন বা জোহান, তাঁর আকৃতি ও স্বভাব ছিল অনেকটা হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো। মাথায় দীর্ঘ জটাজুট; অযত্নে বর্ধিত শ্মশ্রু, কটিতে সামান্য বস্ত্র, তীব্র জ্যোতির্ময় চোখ।

জোহান মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে সিংহের মতো চীৎকার করে বলতেন, "তোমরা পরিতাপ করো, কারণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের দিন ঐ অদূরে।" "Repent ye, for the Kingdom of God is at hand,"—দলে দলে ভয়ার্ত মানুষ এসে ভিড় করতে লাগলো তাঁর কাছে। জোহান তাদের জর্ডান নদীর জলে স্নান করিয়ে পবিত্র করে দিতেন এবং বলতেন, "আমি তোমাদের দেহ পবিত্র করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু একজন আছেন যিনি তাঁর নিজের পুণ্য আত্মা দিয়ে তোমাদের পাপ পরিশুদ্ধ করে দেবেন।" জোহানের জনপ্রিয়তা দেখে ইহুদী পুরোহিতরা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলো—ইহুদী পুরোহিতরা ছিল মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের চেয়েও বেশী ক্ষমতালোভী এবং ঈর্ষাকাতর।

বহু লোক আসছে জোহানের কাছে, একদিন যীশুখ্রীষ্টও এলেন। সরল সাধারণ একটি মানুষ। এসে অন্য সকলের মতোই বললেন, "আমাকে জর্ডানের জলে স্নান করিয়ে পবিত্র করে দিন।" জোহান এবং যীশু দুজনে প্রায় সমবয়স্ক, উভয়েই যুবক, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, জোহান মাত্র মাস কয়েকের বড় হবেন। জোহান বহুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন যীশুর

দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "I have need to be baptised of thee and comest thou to me?" আমিই তোমার কাছে দীক্ষিত হয়ে পবিত্র হবো, আর তুমি এসেছো আমার কাছে পবিত্র হতে? সম্পূর্ণ অহংকারহীন জোহান চোখ ভরে দেখতে লাগলেন যীশুকে। কিন্তু যীশু বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁকে ব্যাপটাইজ করার জন্যে! জোহান যীশুকে নিয়ে জর্ডান নদীর জলে নামলেন। বুক পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে, এমন সময় দৈববাণী হলো,

This is my beloved son.

জোহানের জীবনের প্রতীক্ষা পূর্ণ হল। এখন তাঁর কাছে জীবনমৃত্যু সমান।

অল্পকাল পরেই জোহানের মৃত্যু হলো, নৃশংস, অমানুষিক সেই মৃত্যু। যীশু, সেণ্ট পল এবং অগণিত খ্রীষ্টান হত্যা পরে শুরু হয়েছিল, জন দি ব্যাপটিস্ট তার প্রথম শহীদ। কিন্তু সে কথা বলার আগে যীশুর বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান করা যাক।

যীশুর জন্ম-তারিখ থেকে ইংরেজী বর্ষ গণনা করা হয়। প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই এখন বি-সি এবং এ-ডি অনুযায়ী বর্ষ গণনা হচ্ছে, যদিও এই গণনায় কিছু ভুল আছে। যীশু জন্মেছিলেন প্রথম এ-ডিতে নয়, চতুর্থ বি-সিতে জুডিয়া প্রদেশের বেথেলহেম শহরে ২৫শে ডিসেম্বর। যীশুর বাবা-মায়ের নাম জোসেফ ও মেরী। পরবর্তী জীবনে যীশু যখনই "আমার পিতা' কথাটি উচ্চারণ করেছেন—তখন তার অর্থ বুঝিয়েছেন ঈশ্বর—এবং মৃত্যুর পূর্বে মেরীকেও সম্ভাষণ করেছিলেন মা বলে নয়, 'নারী' বলে।

যীশুর জন্মক্ষণ এবং শৈশবকালের ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনার কিছুটা মিল আছে। যীশুও জন্মেছিলেন দারুণ দুর্যোগের রাত্রে। এক আস্তাবলের মধ্যে দারুণ শীত, দুর্গন্ধ, আবর্জনা, ঘোড়ার জাবনা দেবার এক গামলার মধ্যে জন্ম হয়েছিল তাঁর। সম্রাটের আদেশে লোক গণনা হবে, শহরগুলিতে জমায়েত হতে হবে সকলকে, ন্যাজারেথ থেকে বেথেলহেমে এসেছিলেন জোসেফ আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কোন সরাইখানায় জায়গা ছিল না। সেই অন্ধকার আস্তাবলে সবার অগোচরে জন্মগ্রহণ করলেন মানুষের দুঃখের দেবতা, সেদিন আকাশে একটি নতুন তারা উঠেছিল। কয়েকদিন বাদেই জোসেফ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেবদূত তাঁকে বলছেন, 'এখনি স্ত্রী এবং শিশু-পুত্রকে নিয়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাও।' ভীত জোসেফ অন্ধকার রাত্রে পায়ে হেঁটে চলে গেলেন মিশরে।

কিছুদিন বাদেই আরম্ভ হল শিশুহত্যা। হেরড নামে এক রোমান সামন্ত কোথা থেকে খবর শুনলেন যে জুডিয়ায় একটি শিশু জন্মেছে, যে ইহুদীদের রাজা হবে। হেরড তখন দৈত্যপতি কংসের মত হুকুম দিলেন যে, দু-বছর পর্যন্ত বয়েসের সব শিশুকে হত্যা করা হোক। বহু সহস্র জননীর কান্নায় দেশ ভরে গেল, কিন্তু যীশু তখন নিরাপদ দূরত্বে।

ছুতোর মিস্তিরির কাজ করতেন জোসেফ। বালক যীশু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পান নি, এমনই গরীব ছিল তাঁদের পরিবার। তাঁর কিশোর বয়সেই বাবার মৃত্যু হয়। তখন তিনি সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন—যতদিন না তাঁর ছোট ভাইবোনেরা বড় হয়ে ওঠে।

কোথাও লেখাপড়া শেখেন নি অথচ আশ্চর্য জ্ঞানগর্ভ কথা তিনি বলতেন কী করে—ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আসলে তাঁর প্রধান শিক্ষক ছিল প্রকৃতি। সময় পেলেই একলা চুপ করে একটা টিলার উপর বসে থাকতেন। হয়তো তিনি বুঝতে পারতেন অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, মেঘ এবং আকাশের ভাষা।

এ ছাড়া তাঁদের গ্রামে মাঝে মাঝে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসতেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও যেতেন সেখানে, যীশু তাঁদের কাছে গিয়ে উপদেশ শুনতেন এবং কখনো কখনো প্রশ্ন করে নিজের নানা সন্দেহ নিরসন করতেন।

জোহান দি ব্যাপটিস্টের কাছে যখন দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন যীশু, তখন তাঁর বয়েস তিরিশ বছর, সেই সময়েই তিনি লোকের কাছে প্রথম পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে। এ তিন বছরই যীশুর উল্লেখযোগ্য কার্যকাল।

জোহানের মৃত্যুঘটনা নিয়ে অস্কার ওয়াইল্ডের বিখ্যাত নাটক আছে, সালোমি। সাধু জোহানকে অত্যাচারী শাসক হেরড যখন দুর্গ-কারাগারে আটকে রাখেন—তখন যীশু চলে গিয়েছিলেন জুডিয়ার মরুভূমির মধ্যে চল্লিশ দিনের অজ্ঞাতবাসে। তাই জোহানের মর্মান্তিক নৃশংস হত্যা তাঁকে দেখতে হয়নি।

হেরড তাঁর ভাইয়ের বৌকে বিয়ে করেছিলেন। এই রমণীর নাম হেরোডিয়াস এবং তার আগের পক্ষের মেয়ের নাম সালোমি। জোহান এই বিবাহ সম্পর্কে নিন্দা করেছিলেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। হেরড যতই অত্যাচারী হোন—তিনি ভয় করতেন তেজস্বী জোহানকে। তিনি জোহানকে নিমন্ত্রণ করলেন রাজপ্রাসাদে। জোহান প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন হেরড নিজে এসে অনুরোধ করলেন জোহানের কাছে—যেন তিনি তাঁর সম্বন্ধে আর

নিন্দা না করেন। কিন্তু, বশীভূত হবার মতো লোক নন জোহান। তখন হেরডের ভয়ংকরী পত্নী মন্ত্রণা দিল—'এমন সাধুর মুণ্ডু কেটে ফেললেই হয়।' কিছুটা কুসংস্কারবশেই হয়তো হেরড তাঁকে হত্যা করতে ভয় পেয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। তাঁর বউ বারবার চেষ্টা করতে লাগলো জোহানকে খুন করার।

তারপর একদিন হেরড অ্যান্টিপাসের জন্মদিন। রাজ্যে আনন্দের স্রোত। রাজসভায় হেরড সবরকম কুৎসিত বিলাসে ডুবে আছেন। রাজসভায় নাচ। দেখাচ্ছিল সালোমি। সেদিন সালোমির নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে হেরড সালোমিকে জিজ্ঞেস করলেন, "সালোমি, সালোমি, কি চাও তুমি? আমি তাই দেবো।" মায়ের শেখানো মতো সালোমি উত্তর দিল, "একটি পাত্রের উপর জোহানের ছিন্ন মুণ্ড!" ঘাতক চলে গেল, ঘুমন্ত অবস্থায় জোহানকে হত্যা করে স্বর্ণপাত্রে তার মুণ্ড চলে এলো রাজসভায়। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বলন্ত, কেশর সমেত সিংহের মত জটাজুটমণ্ডিত সেই নবীন সন্ন্যাসীর মাথা, টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সেই শুরু হল রক্তপাত। যীশুর রক্তেও যা থামেনি।

মরুভূমি এবং অরণ্যে চল্লিশ দিন কাটিয়ে যীশু সিদ্ধিলাভ করলেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা তিনি পরে শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন। শয়তান এসেছিল তাঁকে প্রলোভন দেখাতে। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত তিনি প্রায় কিছুই খান নি, শরীর দুর্বল, শয়তান এসে বললো, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্রই হও, তবে এই পাথরগুলোকে রুটি বানিয়ে দাও তো দেখি! এবং সেই রুটি খেয়েই তুমি ক্ষিদে মেটাতে পারবে। যীশু উত্তর দিলেন, Man shall not live by bread alone।

এই উক্তিটি সভ্য মানুষের জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে আছে। শয়তান তখন যীশুকে জেরুজালেম মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গেল এবং বললো, এখান থেকে লাফিয়ে পড়ো তো! দেখি, তোমার ঈশ্বর তোমাকে কেমন বাঁচায়? যীশু উত্তর দিলেন, ঈশ্বরকে কখনো পরীক্ষা করতে যাওয়া উচিত নয়। শয়তান এবার তাঁকে নিয়ে গেল এক বৃহৎ পর্বতের উপরে। নীচে আনন্দ-সম্ভোগ, রূপ-রস-গন্ধের পৃথিবী। সেই দিকে দেখিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে শয়তান বললো, যদি তুমি আমার ভজনা করো, তোমাকে আমি এইসব দেবো।

'তুমি দূর হও!' যীশুখ্রীষ্ট বললেন।

এবার যীশু তাঁর বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। 'পরমেশ্বরের রাজ্য'

প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হল। দরিদ্র ও সর্বরিক্ত মানুষ, পতিতা রমণী, শান্ত গৃহস্থ সরল বৃদ্ধ, এরা আসতে লাগলো যীশুর কাছে—যীশু খুব সহজ ভাষায় তাদের ঈশ্বরের কথা শোনাতে লাগলেন। যীশু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমতের কথা বলেন নি, গীর্জা কিংবা সংঘ স্থাপনের কথাও তাঁর মনে আসেনি। সাধারণ মানুষের আচরণীয় বিষয়গুলি তিনি বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর অধিকাংশ কথাই যে-কোনো জাতিধর্মের মানুষের মনের কথা। যীশুর বাণীর চেয়েও তাঁর নিজের জীবন আরও বড়। অমন ঔদাসীন্য, অমন সহিষ্ণুতা পৃথিবীর আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখা গেছে কিনা জানি না।

যীশুর চেহারা কেমন ছিল তা সঠিক জানার কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো ছবি নেই, যীশু কোনো গ্রন্থ লেখেন নি—তাঁর শিষ্যদেরও কোনো বিবরণী লিখতে বলে যান নি! যীশুর যে-সব প্রতিকৃতি আছে—সবই পরবর্তীকালে আঁকা। তবু নানা বর্ণনা মিলিয়ে চেহারার একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বেশ দীর্ঘকায় ছিলেন তিনি, যেন ইস্পাতে গড়া—শরীরে একবিন্দু মেদ ছিল না, বরং একটু কৃশ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। একটা সাদা আলখাল্লা পরে একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে গিয়ে আত্মার শুদ্ধি, পরিতাপ এবং আনন্দলোকের কথা বলতেন—সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর গায়ের রং লালচে ছিল না, বরং প্রাচ্যদেশীয়দের মত গৌরবর্ণ। পোশাক বা আহার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ভ্রূক্ষেপহীন। কোন কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ বা অনিচ্ছা ছিল না। গ্যালিলির সমুদ্রপারে টেলহাম নামে ক্ষুদ্র পর্বতমালার উপরে দাঁড়িয়ে যীশু বিশাল জনতার সামনে তাঁর প্রেমধর্মের কথা বর্ণনা করলেন। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় তাঁর কণ্ঠস্বর, কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছেন সমুদ্রের দিকে। খ্রীষ্টান জগতে এই বাণীর নাম Sermon on the mount. বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী।

যীশু অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাইবেলে তার প্রচুর বর্ণনা আছে। এতদিন পরে সে সব কার্যকারণ ব্যাখ্যার অতীত। তবে যীশু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করতে চাইতেন না। ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা উচিত নয়—শয়তানকে তিনি একথা বলেছিলেন। কিন্তু যীশুর মন ছিল দয়া ও করুণায় পূর্ণ! কারুর কষ্ট দেখলে স্বতঃই তাঁর হাত এগিয়ে যেত তাকে সান্ত্বনা দিতে—অনেক সময় অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেত তখন। একদিন পথ দিয়ে যাবার সময় যীশু দেখলেন, লোকেরা একটি মৃতদেহ বহন

করে নিয়ে যাচ্ছে, কোন বিধবার একমাত্র সন্তান, একটু দূরেই শিরাছেঁড়া পাখির মতো ছটফট করছে জননী। বিধবাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। যেন তাঁর নিজের বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। এক সময় তিনি শান্তভাবে স্ত্রীলোকটিকে বললেন, উইপ নট। কেঁদো না!—সেই একটিমাত্র শান্ত কথায় শোকযাত্রা থেমে গেল। যেমন ঘুমন্ত লোককে ধাক্কা দিয়ে জাগায়—সেই রকম যীশু কাছে গিয়ে নিচু হয়ে হাত ধরে মৃত যুবকটিকে ডেকে তুললেন।

একটি কুষ্ঠরোগী বহুদূর থেকে তাঁর কাছে এসে পায়ে লুটিয়ে বলেছিল, প্রভু আমাকে বাঁচাও। তুমি দয়া করলেই আমি সেরে উঠবো। তাঁর আকুলতায় যীশুর আত্মা কেঁদে উঠল, তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আই উইল : বি দাউ ক্লীন। আমি চাই, তুমি পরিচ্ছন্ন হও। অমনি লোকটি কুষ্ঠরোগের ক্লেদ মুক্ত হলো। বাতাসে আগুনের মতো এসব কথা ছড়িয়ে গেল দেশ দেশান্তরে। দলে দলে লোক আসতে লাগলো তাঁকে পরীক্ষা করতে। ইহুদী পুরোহিতরা সচেতন হয়ে উঠলেন, কে এই যীশু?

তারপর একদিন যীশু নিজেই এলেন জেরুজালেমে। একপাল ভয়ঙ্কর নেকড়ের মতো ইহুদী পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ফরিসিদের মধ্যে। ওই তাঁর শেষ যাত্রা। পথে একজন ভক্ত বললেন, প্রভু আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাবো। যীশু উত্তর দিলেন, শৃগালেরও থাকার গর্ত আছে, পাখিরও বাসা আছে—কিন্তু এই বিশাল বিশ্বে আমার মাথা গুঁজবার একটুও স্থান নেই।—এখন তিনি যেন অত্যন্ত অস্থির। জেরুজালেমের মন্দিরে ঢুকে তিনি টাকা-পয়সার টেবিল উল্টে দিলেন, সুদখোরদের দিলেন তাড়িয়ে। বললেন, এই ইট কাঠ পাথরের দিকে তাকিও না, আমার কথা শোনো। বললেন, আমি এই মন্দির ভেঙে দেবো! যেখানে বলির জন্য ঘুঘুপাখি বিক্রয় হচ্ছিল—সেগুলি উড়িয়ে দিলেন।

পুরোহিতদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এই ধৃষ্ট ছোকরাকে উচিত শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। প্রথমে ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘ দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন—অর্থাৎ যীশুর মুখ দিয়ে যদি কোন রাজবিরোধী কথা বার করা যায় তবে রোমান শাসকই তাকে হত্যা করবে। তারা নানা-রকম প্রশ্ন করে এই তরুণ সাধুকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করলো।

ফরিসিরা একদিন জনতার সামনে যীশুকে প্রশ্ন করলেন অত্যন্ত বিনয় এবং সরলতার ভান করে, "আপনি তো ভগবানের সত্য প্রচার করছেন, মানুষের শক্তি গ্রাহ্য করেন না। আপনার মতে আমাদের কি রোমান সম্রাট

সীজারকে কর দেওয়া উচিত ?”—উদ্দেশ্য এই যে, যীশুর উত্তর যদি রাজার দিকে যায় তবে তাঁর মহত্ত্ব থাকবে না—আর বিরুদ্ধে বললে রাজদ্রোহ হবে। কিন্তু যীশুর মহত্ত্ব ও বুদ্ধি তাদের ধারণার অতীত। প্রশ্নকারীদের হাতে একটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল। তাতে রোম-সম্রাটের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। যীশু সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধীরভাবে বললেন, “সীজারের মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা সীজারের—ওটা রাজাকেই দেবে—আর যা কিছু ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দেবে!” এই উত্তর শুনে হেঁটমুখে চলে গেল ফরিসিরা।

আর একদিনের ঘটনা। পুরোহিতরা একটি কুলটা স্ত্রীলোককে টেনে-হিঁচড়ে এনেছে যীশুর কাছে। সেকালে নিয়ম ছিল পাপীয়সীদের সকলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতো। ফরিসিরা দেখতে চায়, দয়ার দেবতা এর সম্বন্ধে কী বলেন ? একে মারতে বলবেন, না ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলবেন। যীশু তাদের কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন—একটা কাঠি দিয়ে মাটির উপর কতকগুলি নাম লিখতে লাগলেন—সেই নামগুলি কয়েকজন বিখ্যাত পুরোহিত ও ফরিসির, যাদের নৈতিক চরিত্রের দুর্নাম সর্ববিদিত। তারপর মুখ তুলে ইস্পাতের ছুরির মত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কখনো জীবনে কোন পাপ করনি—সেই প্রথম পাথর ছুঁড়ুক। সেই কণ্ঠস্বর সহ্য করবার শক্তি ছিল না কারুর। এক এক করে পিছু হঠতে হঠতে সকলেই পালিয়ে গেল। যীশু তাকিয়ে দেখলেন—সেখানে একটিও লোক নেই। শুধু বলির পশুর মত কাঁপছে অনুতপ্ত মেয়েটি। যীশু তাঁকে বললেন—গো, অ্যাণ্ড সিন নো মোর। যাও, আর কখনো পাপ কোরো না। মেয়েটি চিরকালের ক্ষমা পেয়ে গেল।

পরাজিত পুরোহিতরা গোপন শলাপরামর্শ করে ঠিক করলো, এই ছোকরাকে হত্যা করা হবে। যীশুখ্রীষ্ট এবং ইহুদীধর্ম—দুটো একসঙ্গে থাকতে পারে না। বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে দশটা আন্দাজ কয়েকজন অস্ত্রধারী রোমান সৈন্য যীশুকে ধরে-বেঁধে নিয়ে গেল—তাদের পথপ্রদর্শক যীশুরই এক শিষ্য জুডাস। শেষের সেই রাত্রির বর্ণনা মর্মস্পর্শী। খৃষ্টান জগতে যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ Passion Week নামে পরিচিত।

কয়েকদিন ধরে যীশু একটু উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল। শিষ্যদের সঙ্গে গ্রামের এক বাড়িতে থাকতেন তিনি। রাত্রে শিষ্যরা ঘুমোলেও তিনি ধ্যানীর মতন বসে থাকতেন। যেন মৃত্যুর গন্ধ তাঁর শরীরে লেগেছে। মধ্যরাত্রে বলে উঠছেন, Now is my soul troubled। অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা শিষ্যদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে বসেছেন, তাঁর ইহজীবনের শেষ আহার—Last Supper। একটি রুটি ভেঙে টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "Take it, this is my body।" একটু দ্রাক্ষারস সকলকে ভাগ করে দিয়ে বললেন, "এই আমার রক্ত, এই রক্ত আমি পাপীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিসর্জন দিয়েছি।"

আহার শেষ হলে যীশু এক আশ্চর্য কাজ করলেন। এক গামলা জল আর একটি তোয়ালে নিয়ে তিনি প্রত্যেক শিষ্যের পা যত্ন করে ধুয়ে মুছে দিতে লাগলেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত নির্বাক। একটু পরে তাদের প্রভু বললেন, তোমরা এখন পবিত্র হয়েছো, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে।—তারপর হঠাৎ বললেন, তোমাদের একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ভক্তরা সচকিত হয়ে উঠলো। কে, কে সে!

ভক্ত পিটার বললেন, আমি, আমি কখনও হবো না।

সঙ্গে সঙ্গে যীশু বললেন, আজ রাত্রি ভোরে মুরগী ডেকে ওঠার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।

ক্ষুব্ধ পিটার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তিনি প্রভুর জন্য মৃত্যুবরণ করতেও রাজি, তবুও তাঁকে অস্বীকার করবেন না। কিন্তু সেদিনই শেষ রাত্রে পিটার ধরা পড়ার ভয় পেয়ে বলেছিলেন, না, আমি যীশুকে চিনি না।

যীশুকে যখন ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছিল, সেই সময়, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন পিটার। একটি দাসী তাঁকে চিনতে পারে। পিটার বলে উঠলেন, না, না, আমি যীশুর শিষ্য নই। তারপর আর একবার। সেবারও তিনি অস্বীকার করলেন। তৃতীয়বার ধরা পড়ায় সকলে হৈ হৈ করে ওঠে এবং তাঁকে মারতে শুরু করে—। পিটার বলে উঠলেন, না আমি যীশুর শিষ্য নই, আমি তাকে চিনি না। ঠিক এই সময় ভোরের প্রথম মুরগী তিনবার ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পিটারের মনে পড়লো গুরুদেবের কথা। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিন্তু আসল বিশ্বাসঘাতক ছিল জুডাস ইসকারিয়াট। শিষ্যদের সঙ্গে যখন যীশু কথা বলছেন—তখন চুপি চুপি সরে পড়লো জুডাস এবং মাত্র তিরিশটি মুদ্রার বিনিময়ে শত্রুপক্ষের হাতে গুরুকে ধরিয়ে দিতে রাজী হলো। আসলে জুডাসের ঈর্ষা ছিল অন্য শিষ্যদের প্রতি। জুডাস যখন যীশুর কাছে গিয়ে বিদায় চুম্বন দিল, তখন যীশু প্রসন্ন গলায় তাকে বললেন, এই চুম্বনের সঙ্গে তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

গভীর রাত্রে যীশু প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে, Thy will be done! ঠিক সেই সময়ে সৈন্যরা ঘিরে ফেললো তাঁকে। চামড়া দিয়ে হাত দুখানা বেঁধে ফেললো তাঁর। উত্তেজিত পিটার একটা তলোয়ার নিয়ে প্রভুকে বাঁচাবার জন্য সৈন্যদের আক্রমণ করলেন, কিন্তু যীশু বারণ করলেন পিটারকে। খানিকটা পরেই সব শিষ্যরা পালিয়ে গেল, নিঃসঙ্গ হলেন যীশু। মশালের আলোয় চারিদিক তখন ভয়ঙ্কর।

প্রহরীরা ধরে নিয়ে গেল তাঁকে ইহুদী পুরোহিত-নেতার বাড়িতে। সেখানে ইহুদীদের ধর্মসভায় তাঁর বিচার হল। একেবারে নকল বিচার—কারণ আসামীর অপরাধ আগেই ঠিক করা ছিল। একজন সাক্ষী বললো, "সে নিজের কানে শুনেছে যে, যীশু বলেছে, আমি জেরুজালেমের মন্দির ভেঙে দেবো এবং তিনদিনের মধ্যে আবার বানাবো।" যীশুকে অনেক প্রশ্ন করা হল, কিন্তু তিনি আগাগোড়া নিরুত্তর। ঢেউহীন সমুদ্রের মতো। ধর্মসভায় একজন বাদে সকলেই যীশুর অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত।

কিন্তু কাউকে মেরে ফেলবার আইনত অধিকার পুরোহিতদের ছিল না। সুতরাং পরদিন সকালে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল রোমান শাসক পনটিয়াস পাইলেটের কাছে। যে মুক্তিদাতার জন্য ইহুদীরা প্রতীক্ষায় ছিল, তাঁকে হাতে পেয়েও তারা হত্যা করতে চলেছে। দুপাশে কৌতুহলী জনতা—তার মধ্যে চলেছেন যীশু। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল জুডাস—একবার যীশুর অবস্থাটা দেখার ইচ্ছে। দড়ির বাঁধন কেটে বসেছে শরীরে, রক্ত ঝরছে, রাত্রি জাগরণে শরীর অবসন্ন, জনতা গায়ে থুতু ছেটাচ্ছে, যে ইচ্ছে কিল, চড় মারছে। তবু ঐ জর্জরিত শরীর রৌদ্রের আলো পড়ে জ্যোতিষ্মান। হঠাৎ যীশু মুখ তুলে পাশে তাকালেন, সোজা জুডাসের সঙ্গে চোখাচোখি হল। প্রচণ্ডভাবে মুচড়ে উঠলো জুডাসের হৃৎপিণ্ড—এই কি কোন মানুষের চোখ! এ চোখে ক্রোধ নেই, ভর্ৎসনা নেই, দুঃখ নেই, ঘৃণা নেই—হাজার বৎসরের সঞ্চিত তুষারের মতো শান্ত। জুডাস ছুটে গেল সেখান থেকে—পুরোহিতের কাছে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে সেইদিনই গলায় দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করলো।

জনতা এসে থামলো লাট সাহেবের বাড়ির সামনে। পনটিয়াস পাইলেট এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না—কিন্তু পুরোহিতদের বেশী ঘাঁটানো তিনি পছন্দ করতেন না—কারণ ইহুদীদের বিদ্রোহ অতিকষ্টে তাঁকে দমন করতে হয়েছে। যীশুকে দেখে একটু যেন ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো তাঁর। ছিন্নভিন্ন শরীরে

এ কী তেজ—এ কি কোন মহাপুরুষ ?

পুরোহিতরা দুটি অভিযোগ করলো আসামীর নামে। এক, এই লোকটা ইহুদীদের মন্দির ভেঙে দেবে বলেছে!—এ কথায় হেসে উঠলেন পাইলেট। ইহুদীদের ধর্মই তো বুজরুকি—মন্দির ভাঙলে ক্ষতি কী ? দ্বিতীয় অভিযোগই মারাত্মক, এই লোকটা বলে, আমি ইহুদীদের রাজা। এ কথা তো সাংঘাতিক, এর মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ আছে। লাটসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, তুমি ইহুদীদের রাজা নাকি!"

যীশু বললেন, Thou sayest—শুধু এইটুকু। অর্থাৎ, তুমিই তো বলছো এ কথা। পুরোহিতরা হৈ-হৈ করে উঠলো, মেরে ফেলুন একে। কিন্তু পনটিয়াসের মন সরছে না। এমন সময় অন্দরমহল থেকে একটা ছোট্ট চিরকুট এলো, পনটিয়াসের স্ত্রী লিখছে, তুমি ঐ সাধুটিকে কোন শাস্তি দিও না। কাল রাত্রে আমি ওকে স্বপ্নে দেখেছি। পনটিয়াসের মন আবার দুলে উঠলো, তিনি যেন যীশুকে মুক্তি দেবার জন্যই ব্যগ্র। যীশু চুপ করে আছেন, তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা চলেছে। উত্তর নেই। পনটিয়াস বার বার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলছো, তুমি ইহুদীদের রাজা ?

যীশু এবার শুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার রাজত্ব এ পৃথিবীর নয়। যদি তা হতো, তবে আমার প্রহরীরা বলপ্রয়োগ করে আমাকে ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষা করতো। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি পৃথিবীতে এসেছি!"

পাইলেট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি এই লোকটার কোনো অন্যায় দেখতে পাচ্ছি না।" সে সময় রাজ্যে একটা উৎসব চলছিল—সেই উপলক্ষে কোন কোন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হতো। পাইলেট বললেন, অন্তত উৎসবের জন্য এবার এই "ইহুদীদের রাজা"কে যদি মুক্তি দিই ?

—না, না, ওকে নয়, দস্যু বারাব্বাসকে মুক্তি দিন, বারাব্বাসকে! জনতা উত্তর দিল। পাইলেট জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটা এমন কী অপরাধ করেছে ?

—ওকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারুন! জনতা চেঁচিয়ে উঠলো।

হতচকিত পাইলেট যতবার একথা জিজ্ঞেস করলেন—ততবার ঐ একই উত্তর। তখন পাইলেট বললেন, আমি এই সাধু লোকটির রক্তপাতের পাপ ভোগ করতে চাই না। তোমরা এ জন্য দায়ী হবে ?

ইহুদীরা চিৎকার করে উঠলো, "হিজ ব্লাড বি অন আস, অ্যাণ্ড অন আওয়ার চিলড্রেন।

পাইলেট তখন যীশুর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

এবার শুরু হল অত্যাচার। সে-রকম অত্যাচার শুধু যীশুর মত দু-একজন মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টান নারী-পুরুষ যখন কোন শোক-দুঃখ বিচ্ছেদ বা আঘাত পায়, তখন সে ক্রুশ জড়িয়ে ধরে, তার কারণ, তারা মনে করে, যীশু যে কষ্ট সহ্য করেছিলেন তার তুলনায় আমাদের কষ্ট কিছুই না! সৈন্যরা যীশুকে চামড়া আর লোহা বাঁধান চাবুক দিয়ে মারতে শুরু করলো। এক এক ঘা চাবুক মারা হচ্ছে—আনন্দে হৈ-হৈ করছে জনতা, আর যাঁকে মারা হচ্ছে তাঁর মুখে একটু শব্দ নেই, মুখের একটিও রেখা কাঁপছে না। তারপর সকলে একটা লাল আলখাল্লা পরিয়ে দিল তাঁকে—ঐটা রাজার পোশাক। বাগানের বেড়া থেকে শক্ত বড় বড় পেরেকের মত কাঁটাতার এনে পরিয়ে দিল মাথায় মুকুট করে, হাতে একটা লম্বা লাঠি দিল, রাজদণ্ড—তারপর ছোট ছেলেরা যেমন রাস্তায় পাগল দেখে ক্ষ্যাপায় সেইরকম 'ইহুদীদের রাজা', 'ইহুদীদের রাজা' বলে তাঁকে লাথি, থুতু, ঘুষি উপহার দিতে লাগলো। জামাটা কেড়ে নিল একটু বাদেই, একজন লাঠিটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে মারলো তাঁর মাথায়, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। যীশু নিঃশব্দ। শেষ পর্যন্ত তাঁর শরীরে এক টুকরো ন্যাকড়ার ফেট্টি ছাড়া আর কিছুই রইলো না। আর রয়ে গেল সেই কাঁটার মুকুট। এই মুকুট আমৃত্যু তাঁর মাথায় ছিল।

যে ক্রুশে বিঁধিয়ে তাঁকে মারা হবে সেই ক্রুশ তাঁর কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে এবার নিয়ে আসা হল ক্যালভরি বা গলগোথার বধ্যভূমিতে। সেখানে এসে যীশু একবার একটু জল খেতে চাইলেন। রোমান সৈন্যরা এক পাত্র কড়া মদ এনে রাখলো। অতখানি অত্যাচারিত শরীরে কী প্রচণ্ড তৃষ্ণা আসে—তবু সেই মদ তিনি জিভ দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পেরেই ফিরিয়ে দিলেন।

যোগচিহ্নের মত সেই ক্রুশকাষ্ঠে শোয়ানো হল যীশুকে—সেইদিনই আরও দুজন ছিঁচকে চোরকে আনা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড দিতে—প্রথমে যীশুর হাতে-পায়েই পেরেক পোঁতা হল। বিরাট বিরাট লোহার গজাল হাতুড়ি দিয়ে ঠোকা হচ্ছে দুই হাত আর পায়ের পাতায়। যীশুখ্রীষ্টের মুখে একটু কাতর শব্দ নেই। হাতুড়ি ঠোকা থামিয়ে ঘাতকেরা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখছে যীশুকে। তারা সারাজীবনে কখনও এমন দেখেনি। চোর দুটোকে ক্রুশের উপর শোয়ানো হতেই তারা বুনো শুয়োরের মতো বিকট গর্জন করে আবহাওয়া দূষিত করে তুললো।

৩রা এপ্রিল বেলা বারোটার সময় ক্রুশ-কাষ্ঠ উঁচু করে তুলে পোঁতা হল।

পরনে মাত্র একটি কৌপীন, মাথায় কাঁটার মুকুট—ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলে রইলেন মানুষের দুঃখের রাজা।

ইহুদীরা মজা দেখছে। গালাগালি টিট্‌কিরি তখনও থামে নি।

"খুব যে ভগবানে বিশ্বাস ছিল, এখন ভগবান এসে তাঁকে বাঁচাক না!"

"মন্দির ভেঙে দেবে বলে হুমকি দিয়েছিলে বাছাধন, এখন ক্রুশকাঠটা ভেঙে নীচে এসো না!"

হঠাৎ তারা দেখল, যীশুর ক্রুশকাঠে রোমান প্রথামত লেখা রয়েছে, দি কিং অব দি জু'স। যা ঠাট্টা ছিল, তাকেই যে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে! একদল ছুটলো পাইলেটের কাছে নালিশ করতে—ওকে কে রাজা বলেছে, ও তো নিজে নিজেই রাজা! পাইলেট তাদের কথায় কান দিলেন না—তাড়িয়ে দিলেন।

একটু পরে ভিড় একটু পাতলা হয়ে এলে যীশুর মা মেরী আস্তে আস্তে ক্রুশের কাছে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। যীশু তাকালেন মায়ের দিকে। অদূরে জোহান নামে তাঁর এক শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিল। যীশু মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "নারী, তোমার ঐ সন্তানকে দেখ।" তারপর জোহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা মাতাকে দেখ।" শিষ্য গুরুর ইঙ্গিত বুঝলেন; আজীবন তিনি মেরীর ভরণ পোষণ করেছেন।

অনেকে সেই ক্রুশকাঠের উপর চারদিন পাঁচদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে। রোদ-বৃষ্টিতে পোড়ে-ভেজে, কাক-চিল এসে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেয়। অনবরত চীৎকার করতে করতে হতভাগ্যগুলি ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু যীশু বেঁচে ছিলেন মাত্র চার ঘণ্টা। তাঁর অধিকাংশ ভক্ত তখন পলাতক ছিলেন—শুধু তাঁর নারী শিষ্যরা সর্বক্ষণ সেখানে বসে অশ্রুবর্ষণ করছিল।

যীশুর ডানদিকে এবং বাঁ-দিকে দুজন নিম্ন চরিত্রের গুণ্ডা ঝুলছিল। তাদের মধ্যে একজন বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, তুমিই তো সেই 'পরিত্রাতা', না? তুমি নিজেকে বাঁচাচ্ছো না কেন, আর আমাদেরও বাঁচিয়ে দাও। অন্যজন তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে উঠলো, তোর কি ভগবানের ভয় নেই? উনি এবং আমরা দু'জন একই শাস্তি ভোগ করছি। কিন্তু আমরা সত্যি সত্যিই অন্যায় করেছি—তার শাস্তি পাচ্ছি। কিন্তু এই মানুষটা কোন অন্যায় করে নি—তারপর সে যীশুর দিকে ফিরে বললো, যীশু, তুমি যখন সিংহাসন পাবে, তখন আমাকে মনে রেখো। যীশু উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে বলছি, তুমি আজই আমার সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হবে।

দুপুরের দিকে সমগ্র বধ্যভূমি অন্ধকার হয়ে এল। একখণ্ড ঘোর কালো রঙের মেঘে ঢেকে গেল মাথার উপরের আকাশ। সূর্য দেখা গেল না—পাতলা পর্দার মত ছেয়ে রইল অন্ধকার। রোমান প্রহরীরা অবাক হয়ে মাথার উপরে তাকালো। এই সময় যীশু বললেন, মাই গড, মাই গড, হোয়াই দাউ হ্যাস্ট ফরসেকন মী? পরমেশ্বর আমার, পরমেশ্বর আমার, কেন আমাকে ত্যাগ করলে? সেই কাতর চীৎকারে প্রথম যেন তাঁর মধ্যে একটু সংশয় দেখা দিল। এখানে তিনি 'আমার পিতা' না বলে 'আমার ঈশ্বর' বলে ডাকছেন। পরমুহূর্তে আবার বিশ্বাস ফিরে পেলেন, তাঁর চোখ পূর্বের মত কোমল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "ফাদার, ফরগিভ দেম, ফর দে নো নট হোয়াট দে ডু!" পিতা এদের ক্ষমা করো—কারণ এরা কি করছে তা এরা জানে না।

সাড়ে তিনটের একটু পরে তিনি বললেন, আই থার্স্ট—আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। রোমান সৈন্যরা একটা কাঠির মাথায় খানিকটা স্পঞ্জ বেঁধে তাতে খানিকটা পানীয় ভিজিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরলো। যীশু সেই পানীয় একটু পান করলেন—রোমান সৈন্যদের প্রতি এই দয়া করেছিলেন তিনি। বেলা চারটের সময় যীশু একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর অনুগত কয়েকটি নারী পুরুষের দিকে একবার তাকালেন—তারপর অত্যন্ত স্পষ্ট এবং জড়তাশূন্য কণ্ঠে বললেন, "ফাদার, আন্টু দাই হ্যাণ্ডস্ আই কমেণ্ড মাই স্পিরিট।" পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মাকে তুলে দিই। এই যীশুর শেষ কথা—সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পে বধ্যভূমি দুলে উঠলো, যীশুর মাথা ঝুঁকে পড়লো বুকের উপর, শেষ।

সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে ঝুলে রইলো মৃতদেহ। তারপর জোসেফ নামে এক দয়াপরবশ সম্ভ্রান্ত ইহুদী, পাইলেটের অনুমতি নিয়ে নামিয়ে নিল তাঁকে—শরীরে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র অচ্ছোদন করে পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় রেখে একখণ্ড বড় পাথরে ভাল করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের দিন শনিবার ইহুদী মতে কর্মবিরতির দিন, তার পরের দিন তাঁকে ভালো করে কবর দেওয়া হবে। ইহুদী পুরোহিতরা গুজব শুনেছিল যে, যীশু নাকি আগে এক সময় বলেছেন যে, মৃত্যুর তিনদিন পরে তিনি সশরীরে কবর থেকে উঠে আসবেন। সুতরাং ইহুদীরা ভাল করে পাহারা দিতে লাগলো গুহামুখ।

রবিবার ভোরবেলা যীশুর প্রখ্যাত শিষ্যা মেরী ম্যাগডালেন গুহার কাছে গিয়ে দেখলেন—গুহার মুখ সম্পূর্ণ খোলা। ভিতরে মৃতদেহ নেই। পরনের

বস্ত্রগুলি পড়ে আছে, কিন্তু আর সব শূন্য। যীশুর মৃতদেহ আর পাওয়া গেল না।

আমরা জীবনী অনুসরণ করতে এখানেই নিবৃত্ত হবো। কারণ, এর পরের ঘটনাগুলিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। মৃত্যুর পরও যীশু নাকি তাঁর একাধিক ভক্তকে দর্শন দিয়েছিলেন। গুহা থেকে ফেরার পথেই দেখা হয় মেরী ম্যাগডালেনের সঙ্গে, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা দর্শন দেন শত্রুভয়ে আত্মগোপনকারী দশজন শিষ্যকে। আটদিন পর তিনি অবিশ্বাসী শিষ্য টমাসকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার অবিশ্বাস হলে তুমি আঙুল দিয়ে আমার ক্ষতস্থান দেখো।

অনেকে এ কথাও বলে থাকেন যে, ক্রুশকাষ্ঠ থেকে নামাবার পর হয়তো যীশু বেঁচে উঠেছিলেন এবং শত্রুদের হাতে আর ধরা না দিয়ে মধ্য-এশিয়ার দিকে চলে যান। এই সময় বা চল্লিশ দিনের সাধনার সময় তিনি একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমন জনরব আছে। কাশ্মীরের কোন একটি কবরকে যীশুর কবর বলেও কথা উঠেছিল এক সময়। কিন্তু এসবই এখন তর্কের বিষয়। তবে, প্রায় দুহাজার বছর ধরে যীশু যে পৃথিবীর বহু মানুষের পরম পূজনীয় থেকেছেন, তার তুলনা পাওয়া ভার।

নির্বাসনে দান্তে

এক নিবিড় অরণ্যে পথ হারিয়ে ঘুরছেন কবি দান্তে। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের শুভ শুক্রবারের ভোরবেলা। এ অরণ্য যেন পৃথিবীর সেই সনাতন অরণ্য, যেখানে সব মানুষই কখনো কখনো পথ হারিয়ে ফেলে, বিভ্রান্ত হয়। ঘুরতে ঘুরতে দান্তে দেখতে পেলেন একটি পর্বত, সেই পর্বতে উঠতে যাবেন, এমন সময় একটা নেকড়ে, একটা সিংহ এবং চিতাবাঘ তিন দিক থেকে এসে আক্রমণ করলো তাঁকে।

এই পৃথিবী এমন অরণ্যসঙ্কুল, এমন হিংস্র শ্বাপদে পূর্ণ—এর মধ্য থেকে কি করে সে নয়নাভিরাম পর্বতে আরোহণ করবেন দান্তে! এমন সময় দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি। এই মূর্তি তাঁর পূর্বসূরী মহাকবি ভার্জিল। সেই সৎ উন্নতমনা, চিরকালের মানুষের আদর্শপুরুষ ভার্জিল তাঁকে পথ দেখালেন।

সেই অরণ্য—পৃথিবীর অবিচার, নির্যাতনের অরণ্য, নির্যাতিত দান্তে সেই অরণ্য ছেড়ে আনন্দ পর্বতে যেতে চান। কিন্তু তিনটি ভয়ংকর হিংস্র জন্তুর মত দুর্লোভ জীবনের অহংকার এবং রক্তমাংসের আকর্ষণ পথরোধ করে। ভার্জিল তাঁকে নিয়ে গেলেন আনন্দ পর্বতে।

ভার্জিল বললেন, পর্বত শিখরে অধিষ্ঠিতা তিন অপরূপা রমণীর নির্দেশে তিনি মর্ত্যের কবি দান্তেকে নিতে এসেছেন। ভার্জিলের হাত ধরে দান্তে এগিয়ে চললেন। প্রতিষ্ঠিত মহাকবি পথ দেখালেন অনুজ কবিকে।

পর্বত শিখরে অপরূপ স্বর্গ। সেখানে পৌঁছোবার আগে দান্তেকে নরক এবং সংশোধনাগার দেখে যেতে হল। নরক এক কোণাকৃতি বিশাল শূন্যতা, ভয়ংকর বুক-কাঁপানো, পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। অ্যারিস্টটল নরককে বিকৃতকাম, বর্বর-হিংসা এবং ঈর্ষা এই তিন পাপের জন্য তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। দান্তের দেখা নরকও সেই রকম। সেই নরকে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করছে। তার মধ্য দিয়ে ভার্জিলকে অনুসরণ করে দান্তে বহু দৃশ্য পার হয়ে যেতে লাগলেন। কত চেনা লোক সেখানে, পৃথিবীর কত বিখ্যাত মানুষ কৃতকর্মের ফলভোগ করছে, দেখলেন দান্তে। পৃথিবীতে যাঁদের বিষম ঘৃণা এবং অপছন্দ করতেন, তাঁদেরই দেখতে পেলেন কুৎসিত কুৎসিত জায়গায়।

নরকের শেষ প্রান্তে বরফের মধ্যে প্রোথিত শয়তান লুসিফার। তাঁর

অঙ্গ বেয়ে এঁরা পৌঁছে গেলেন পৃথিবীর কেন্দ্রে। সেখানে সংশোধনাগার। অল্প-পাপীদের দেহ এবং মন শুদ্ধি হচ্ছে সেখানে। এখানেও অসংখ্য পূর্ব-পরিচিতদের দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন দান্তে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। কখনো বা কারো কারো কাজে সামান্য সাহায্য করতে লাগলেন।

সংশোধনাগার পেরিয়ে যাবার পর এক বিশাল অগ্নিময় পথ। সেই ভয়ংকর আগুন দেখে দান্তে একটু থমকে দাঁড়ালেন। এই লেলিহান অগ্নি কি করে পার হবেন? তখন ভার্জিল বললেন, এই আগুনের ওপারে বিয়াত্রিস আছে। এই আগুন তাঁর এবং বিয়াত্রিসের মধ্যবর্তী দেওয়ালের মত।

বিয়াত্রিস! এই নাম শুনেই দান্তে সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত ক্লান্তি, শ্রম, অবসাদ দূর হয়ে গেল। প্রবল উদ্দীপনায় তিনি অগ্নিপথ পার হয়ে গেলেন! রমণী-শ্রেষ্ঠা বিয়াত্রিস তাঁকে স্বর্গ দর্শন করালেন। চন্দ্র, সূর্য, অনু-পরমাণুর মধ্যে দান্তে এক মুহূর্তের জন্য দেখলেন বিশ্বরূপ। বিয়াত্রিসের সঙ্গলাভ, স্বর্গ দর্শন, ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রভৃতিতে যে আনন্দের কথা দান্তে ডিভাইন কমেডিতে বর্ণনা করেছেন—ইহজীবনে তিনি সে আনন্দ কখনো পান নি। পার্থিব জীবন তাঁকে কাটাতে হয়েছে ঐ নির্যাতনের অরণ্যেই।

বিয়াত্রিস। আসল নাম বিস্ পরতিনারী (Bice Protinari)—কিন্তু এই নাম দান্তের পছন্দ নয় বলে নাম দিয়েছিলেন বিয়াত্রিস (Beatrice)। কেউ কেউ উচ্চারণ করেন বিয়াত্রিচে। এই রমণীকে দান্তে মাত্র একবার জীবনে দেখেছিলেন। যখন বিয়াত্রিসের বয়স সদ্য ন' বছর, দান্তের বয়স ন'বছর পূর্ণ হতে চলেছে। তারপর দান্তের সঙ্গে বিয়াত্রিসের কোন যোগাযোগ হয়নি, বিয়াত্রিশ হয়তো জানতেনও না দান্তের ভালবাসার কথা। কে জানে, দান্তেকে তিনি চিনতেন কি না? কিন্তু একজন কবির কাছে বাস্তব জীবন তো তুচ্ছ, অতি সাধারণ,—বরং কল্পনার যে জীবন, যে জীবন এবং জগৎ তাঁর নিজের সৃষ্টি করা, সেখানে বহুবার বিয়াত্রিসের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে।

বিবাহ হয়েছিল অন্য এক অভিজাত পুরুষের সঙ্গে এবং যখন বিয়াত্রিসের বয়স মাত্র পঁচিশ, যখন তাঁর রূপের পূর্ণ প্রভায় ফ্লরেন্স উদ্ভাসিত—তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রিয়তমার এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ দান্তের কাছে বজ্রাঘাতের মত লেগেছিল—এবং এই ঘটনাই তাঁর জীবনের গতি বদলে দিয়েছিল। অবশ্য কিংবদন্তী আছে যে, বিয়াত্রিসের মৃত্যুর দু'বছর আগে দান্তের সঙ্গে আরেকবার তাঁর দেখা হয়েছিল। অনেক বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবিও আছে এই অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ নিয়ে (পথ দিয়ে বিয়াত্রিস চলেছেন তাঁর

সখীদের নিয়ে—দেয়াল ঘেঁষে তৃষ্ণার্ত দান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, যদি তাঁর দিকে একবার চোখ পড়ে তার জীবন-সর্বস্ব রমণীর!)—কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই। হয়তো শুধুই কিংবদন্তী। যাঁকে শুধু বাল্যবয়সে একবার দেখেছেন তাঁর প্রতি সারাজীবন এমন তীব্র গভীর ভালবাসার কথা পৃথিবীর অপ্রেমিকরা বিশ্বাস করতে চান না।

শঙ্করাচার্য প্রচণ্ড অহংকারে বলেছিলেন, জগতের কোটি কোটি গ্রন্থে যে-কথা লেখা হয়েছে আমি মাত্র আধখানা শ্লোকে সে কথা বলে যাব। দান্তেও প্রায় সেই রকম প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলেছিলেন, আমি বিয়াত্রিসকে নিয়ে এমন রচনা লিখে যাব, যা আজ পর্যন্ত কখনো কোন রমণীকে নিয়ে লেখা হয়নি।

অমন ভালবাসা ছিল দান্তের, কিন্তু কখনো সে ভালবাসা, রক্তমাংস দিয়ে চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন নি। কেন করেন নি কে জানে! বিয়াত্রিসকে তিনি প্রেম নিবেদন করেন নি বা বিবাহ করতে চান নি কখনো—যদিও সামাজিক মর্যাদা বা পারিবারিক অবস্থা তাঁর সামান্য ছিল না মোটেই। অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি, তাঁর কোন এক পূর্বপুরুষ ক্রুসেডে লড়াই করেছিলেন। একসময় দান্তে ফ্লরেন্সের প্রধান পুরুষদের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। অবশ্য জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি ছিলেন নির্বাসিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেই তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে—এই আদেশ প্রচারিত হয়েছিল। 'ইতালীর প্রায় সর্বত্র একজন ভবঘুরের মত, প্রায়-ভিখারীর মত, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমার নির্যাতনের ক্ষতগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি।'

কবি দান্তে এবং মানুষ দান্তের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ছিল। কবি হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। মানুষ হিসাবে ছিলেন বলিষ্ঠ, দৃঢ়মনস্ক, স্বদেশপ্রেমিক, অনবদমিত। কবি এবং মানুষ এই উভয় বিচারেই মহত্ত্বের উদাহরণ আজকাল পৃথিবীতে ক্রমশ কমে আসছে। মানুষ হিসেবে দান্তে পেয়েছিলেন নির্যাতন, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড; কবি হিসেবে পেয়েছিলেন কাব্যের অমরলোক, স্বর্গের শিখর, বিয়াত্রিসের সঙ্গ।

ইওরোপের নবজাগরণের প্রথম সূচনা হয় ইতালিতে। দান্তে আলিঘিয়েরির জন্মও হয় সেই রেনেসাঁসের জন্মক্ষণে, ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফ্লরেন্সে। অভিজাত পরিবারের সন্তান, শিল্প এবং সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন, ছাত্র হিসেবেও ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। যৌবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন

এবং পড়েছিলেন পোপের কোপানলে। ইওরোপের তৎকালীন ইতিহাসের যে-কোনো ছাত্র জানেন যে, সম্রাটের তুলনায় পোপের ক্ষমতা ছিল তখন কত বেশী।

ইওরোপ, বিশেষত ফ্লরেন্সের রাজনীতি তখন ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং দলীয় ভেদাভেদে মত্ত। প্রধান দুটি দল ছিল গেল্ফ এবং ঘিবেলিন। দু' দলে প্রায়ই লড়াই লেগে থাকতো, কথায় কথায়, পথে পথে, রক্তস্রোত। 'কালো' এবং 'সাদা' এই নামেও দু' দলকে ডাকা হ'তো। দান্তে ছিলেন সাদা অর্থাৎ ঘিবেলিন দলের। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমস্ত দেশ, এমনকি সমস্ত পৃথিবী এক শাসনের অধীনে থাকা উচিত, তবেই পৃথিবীতে আসবে সুচির শান্তি এবং সমৃদ্ধি। এ জন্য দান্তে কোন একজন সম্রাটের কর্তৃত্ব মানতেও রাজী ছিলেন। দান্তে পোপের অধিকার স্বীকার করতেন, কিন্তু তা শুধু ধর্মীয় কারণে—রাজনৈতিক বিষয়ে পোপের হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে চান নি।

গেল্ফ অর্থাৎ কালো দল ছিল পোপের অন্ধ-অনুরাগী—বিপদে পড়লেই তারা পোপের কাছে সাহায্য চাইতো এবং পোপ অন্যান্য দেশের রাজাদের হুকুম করতেন সৈন্য দিয়ে গেল্ফদের সাহায্য করতে। গেল্ফ এবং ঘিবেলিনদের সাময়িক অভ্যুত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ভর করতো দান্তেরও উন্নতি অবনতি। অনেক সময় তিনি উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। একবার বিচারক হয়েছিলেন—এমন কি দু'মাসের জন্য তিনি ফ্লরেন্সের ছ'জন প্রধান পুরুষের অন্যতম হিসেবে নির্বাচিতও হয়েছিলেন।

চব্বিশ বছর বয়সে কম্পালডিনো যুদ্ধে দান্তে যোগ দিয়েছিলেন সৈনিক হিসেবে। সেখান থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই তিনি শুনলেন, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বিয়াত্রিসের মৃত্যুসংবাদ! যুদ্ধের যে-কোন অস্ত্রাঘাত এই নিদারুণ সংবাদের চেয়ে মারাত্মক ছিল না। তিনি অবসন্ন, অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের মণি নিভে গিয়ে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। এই স্বপ্নবৎ শোকের কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ একদিন মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন বিয়াত্রিসকে। স্বপ্নের মধ্যে দেখে তখন তিনি যে অমর গীতিকবিতাগুচ্ছ রচনা করলেন—তারই নাম ভিটা নোভা, Vita Nuova (নবজীবন)। এই ভিটা নোভা যেন ডিভাইন কমেডিরই প্রস্তুতি পর্ব।

'ভিটা নোভা'তে দান্তে বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে তাঁরই জীবন কাহিনী ;—কিভাবে বালক বয়সে বিয়াত্রিসের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, কিভাবে অন্তরের প্রেম গোপন করে ছদ্ম ভালবাসার ভাণ করলেন, কিভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে স্বপ্নে বিয়াত্রিসের মৃত্যু দেখলেন এবং কিভাবে আর একটি রমণী এসে কোমল

ব্যবহারে তাঁর পূর্ব প্রেমের ক্ষত নিবৃত্তি করলো এবং কিভাবে বিয়াত্রিস আবার কল্পনায় ফিরে এসে তাঁর হৃদয় অধিকার করলো এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে তিনি এক দিব্যদৃষ্টি পেলেন, যার প্রেরণায় তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে আরও গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে—যাতে তিনি লেখক হিসেবে শক্তিমান হতে পারেন এবং যে বিয়াত্রিস সর্বক্ষণ ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছেন তাঁকে নিজস্ব লেখার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত করতে পারেন।

এই বর্ণনায় উক্ত 'আরেকটি রমণী' সম্ভবত তাঁর স্ত্রী। দান্তে এমনই বাস্তব-নিরপেক্ষ যে, বিয়াত্রিসের প্রতি তাঁর আজীবনের অমর প্রেমও তাঁকে অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে নি। গিম্মা ডোনাতি নামে একটি মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং জনক হয়েছিলেন পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের। হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল না। কারণ দীর্ঘ কুড়ি বছরের নির্বাসিত জীবনে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন না।

বিয়াত্রিসের মৃত্যুতে তাঁর যে কাতরতা, যে পরম দুঃখ বোধ থেকে কবিতার জন্ম—তার বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হয় নি তাঁর বাস্তব জীবনে। প্রিয়তমার মৃত্যু তাঁকে নিশ্চেষ্ট বা অকর্মণ্য করে নি। কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। বিরুদ্ধ পক্ষের চক্ষুশূল হলেন, অত্যন্ত বিরাগভাজন হলেন পোপের।

১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্বেত' দলের পক্ষ থেকে তিন জন দূতকে পোপের কাছে রোমে পাঠানো হল, ফ্লরেন্সের সম্পূর্ণ অবস্থা বুঝিয়ে বলার জন্য। দান্তে ছিলেন সেই তিনজনের অন্যতম। পোপ তাঁদের কথা শুনবার জন্য খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না। পোপের নির্দেশে চার্লস অব ভ্যালোয়া সসৈন্যে এসে আক্রমণ করলেন ফ্লরেন্স, 'কৃষ্ণপক্ষ' তাঁকে সমর্থন করলো এবং তার ফলে ঘিবেলিনরা সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হল। রোমে বসে দান্তে এই সংবাদ শুনলেন।

কালো দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে শুরু করলো এক বিচার প্রহসন। বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হিসেবে দান্তের বিচার শুরু হল। আসামী হাজির নেই, তাঁর পক্ষে বলবার কেউ নেই, তবুও তাঁর নামে বিচার।

—দান্তে আলিঘিয়েরি হাজির ?

—না হাজির নেই।

—ঠিক আছে। ওর নামে অভিযোগ কি ?

—অনেক অনেক, ও আমাদের শত্রু। ও মহা-বদমাস্। ও ঘিবেলিন দলের লোক।

অভিযোগ হল, দান্তে এবং তাঁর দলের এই লোকগুলি অসৎ এবং বিশেষতঃ এরা গেল্‌ফ অর্থাৎ কালো দলের শত্রু! বাদ প্রতিবাদের কোন প্রশ্ন নেই। সঙ্গে সঙ্গে পোপের নির্দেশে শাস্তি হয়ে গেল। দান্তের শাস্তি হল ৫০০০ ইতালিয়ান মুদ্রা জরিমানা। তিনদিনের মধ্যে না দিলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলা হবে এবং জরিমানা দিলেও দু'বছরের জন্য তাসকানিতে নির্বাসিত এবং ভবিষ্যতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় পদের অনুপযুক্ত হবেন। এমন চমৎকার শাস্তির সুযোগ দান্তে গ্রহণ করলেন না—জরিমানার টাকা পৌঁছালো না তিনদিনের মধ্যে। দান্তের এই উপেক্ষায় প্রতিপক্ষের ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হল এবং ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ ঘোষণা করা হল যে, দান্তেকে কোনক্রমে ধরতে পারলেই তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হবে।

শুরু হল দান্তের পলাতক জীবন!

দান্তে তখন আরেৎজোতে তাঁর দলের অন্যান্য প্রতি বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পোপের স্বৈরাচারের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করলেন। অল্পকালের মধ্যেই, ঐ বছর জুলাই মাসে তাঁরা ফ্লরেন্স আক্রমণ করলেন। দেশোদ্ধারের জন্য নির্বাসিতদের অভ্যুত্থান। কিন্তু আক্রমণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার পলায়ন, গুপ্ত পরিকল্পনা, ক্রমে নিজেদের মধ্যে মতের গরমিল এসে গেল। কিছুকাল পরে দান্তে তাঁর সঙ্গীদের মূর্খ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বিবেচনা করে পরিত্যাগ করলেন এবং ঠিক করলেন নিজেই আর একটি দল গঠন করবেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছে কাজে পরিণত হয়নি।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সপ্তম হেনরি জার্মানির সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন দান্তের মনে আবার নতুন আশা জেগে উঠলো। সম্রাট হয়তো বাহুবলে সমগ্র দেশকে এক নতুন সূত্রে বাঁধবেন। ফ্লরেন্সের বিশৃঙ্খলা মিটে যাবে, তিনি আবার দেখতে পাবেন তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমি, যেখানে বিয়াত্রিস শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। প্রবল উৎসাহে দান্তে চিঠি লিখলেন সম্রাটের কাছে। সম্রাট ইতালি জয়ের জন্য সমর অভিযানে বেরুলেন। ইওরোপের আকাশে আবার যুদ্ধের ঝড়। কিন্তু সিয়েনার পরে এসে সম্রাটের বিষম জ্বর হলো। আর অগ্রসর হতে পারলেন না। সেই জ্বরেই ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যু হল এবং নিঃশেষিত হয়ে গেল দান্তে এবং তাঁর দলের সকলের সমস্ত আশা।

জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর দান্তেকে পলাতক জীবন যাপন করতে হয়েছে। বিপক্ষ দলের হাতে ধরা পড়লেই মৃত্যু। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ে ঠিক কখন কোথায় তিনি ছিলেন, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। সে-সময়কার

অবস্থা সম্বন্ধে দান্তে মর্মস্পর্শীভাবে বলেছেন, 'আমি একজন ভবঘুরের মত, প্রায় ভিখারির মত, ইতালির সর্বত্র আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নির্যাতনের ক্ষতগুলি দেখিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।' যাঁরা কল্পনা-ব্যবসায়ী, তাঁদের প্রায় সকলেরই জন্মভূমির প্রতি তীব্র টান থাকে। যখন যেখানেই থেকেছেন, তাঁর দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেছে ফ্লরেন্সে দিকে।

মৃত্যুর আগে দান্তের আরও দুবার বিচার হয়েছিল। বলা বাহুল্য দুবারই দান্তের অনুপস্থিতিতে। যখন তিনি সম্রাট সপ্তম হেনরিকে চিঠি লেখেন ইতালিতে আসবার জন্য, তখন ফ্লরেন্সে মহা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। দান্তেকে পুনর্বার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাঁকে বন্দী করার খুব চেষ্টা চলে। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আবহাওয়া কিছুটা শান্ত, তখন আবার বিচার হল। খানিকটা করুণা করলেন বিচারকরা! সেবার ঘোষণা করা হল, তাঁকে জরিমানা দিতেই হবে এবং নতজানু হয়ে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান মেনে নিতে হবে। এই করুণার অপমান দান্তে মানেন নি। তাঁর আত্মশ্লাঘা কখনও ন্যূন হয়নি। তিনি দৃপ্ত ভাষায় জানিয়েছিলেন—নিজের জন্মভূমিতে আমি সসম্মানে প্রবেশ করতে চাই। নচেৎ প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর যে-কোন অংশ থেকেই আমি সূর্য এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবো, দর্শনের মধুরতম সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হবো।

পলাতক জীবনে তিনি ইতালির অনেক অভিজাত পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং বংশগৌরবের জন্য। শোনা যায় ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে অক্সফোর্ডেও তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। প্যারিসে একবার গিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম আশ্রয়দাতা ছিলেন লর্ড অব ভেরোনা। লুনিগিয়ানার মার্কুইসের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন একবার। শেষ জীবনে দান্তে র‍্যাভেন্না-তে কাটিয়েছেন—এখানে তাঁর রক্ষক গুইডো দা পোলেন্টা। এইরকম অপরের আশ্রয়ে জীবন কাটানো সম্পর্কে দান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমি জানতে পেরেছি, অপরের রুটিতে ভাগ বসালে নুনের স্বাদ কেমন লাগে এবং অপরের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা কত কঠিন!

প্রিয়তমা এবং দেশ—কারুর কাছেই ইহজীবনে আশ্রয় পাননি হতভাগ্য কবি। কিন্তু তিনি স্বর্গের সোপান পেয়েছিলেন।

নির্বাসনকালেই দান্তে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি লেখেন। 'দি-কনভিভো' তাঁর প্রাপ্ত বয়সের লেখা কাব্য। ইতালির ভাষাকে সাহিত্য-ভাষা হিসেবে

তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। পৃথিবীর সর্বত্র জল এবং মৃত্তিকার উচ্চতা সমান কিনা এ-বিষয়েও তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। আর অনবরত লেখা হয়ে চললো ডিভাইন কমেডি। এই জন্মবিরহী, ভাগ্য বিড়ম্বিত পুরুষের সমস্ত প্রাণবিন্দু ঝড়ে পড়ে ডিভাইন কমেডিতে। তাঁর এক জন্মের ক্রোধ, অভিজ্ঞতা, প্রেম, আদর্শ, সম্পূর্ণ সঞ্চিত রেখেছিলেন এই কাব্য রচনার জন্য। এই কাব্য তিনি শুধু আনন্দ দেবার জন্য লেখেননি—সংস্কার, তিরস্কার এবং সুপরামর্শের জন্য লিখেছিলেন। এ-কাব্যের নায়ক তিনি নিজে, চরিত্রগুলি সকলেরই চেনা। বাস্তব জীবনে পরাজিত দান্তে নিজের সৃষ্টি করা জগতে স্বর্গ-শিখরে আহোরণ করলেন।

ডিভিনা কোমডিয়া বা ডিভাইন কমেডির নাম দান্তে দিয়েছিলেন শুধু কমেডি। জনসাধারণের প্রবল সম্মান ডিভাইন কথাটি সংযোজন করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর আগে এই কাব্যের আখ্যাপত্রে 'ডিভাইন' কথাটি দেখা যায় নি। আপাত চোখে এই কাব্যটিতে মনে হয় স্বর্গযাত্রার বর্ণনা।

কিন্তু ভিতরে ৩, ৭, ৯ এবং ১০ এই সংখ্যাগুলির অবিরল সাঙ্কেতিক ব্যবহার। একটা চিঠিতে দান্তে বলেছিলেন, এই কাব্যের একটি আছে আক্ষরিক অর্থ, সেই সঙ্গে বহু রূপক অর্থ। যেমন, শুরুতেই আছে 'অন্ধকার অরণ্যে' ঘুরছেন দান্তে। আক্ষরিক ভাবে মনে হয় জঙ্গলে একটি লোক পথ হারিয়েছে। কিন্তু এর তিনটে আলাদা সাঙ্কেতিক অর্থ। আধ্যাত্মিক অর্থে—ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক দূরত্ব। রাজনৈতিক অর্থে দান্তের সময়ের ইতালির বিশৃঙ্খল নৈরাজ্য। নৈতিক অর্থে জীবনের অযোগ্য, পাপ পথ। সমগ্র কাব্যটি দুঃখ থেকে আনন্দলোকে উত্তরণ।

১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয় কবি র‍্যাভেন্নাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর বহু বছর পর ফ্লরেন্সে থেকে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা—যাঁর নামও দান্তে রেখেছিলেন বিয়াত্রিস, তিনি তখন মঠে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন, তাঁর কাছে পিতার সম্মান চিহ্ন পাঠানো হল। দান্তে সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য নিযুক্ত করা হল বোকাচ্চিওকে, সাধারণে যার পরিচয় অশ্লীল সাহিত্যের রাজা হিসেবে, আসলে যিনি ইতালির গদ্য সাহিত্যের জনক। গদ্য সাহিত্যের জনক ব্যাখ্যাতা হলেন কবি সম্রাটের।

দান্তে সম্পর্কে শেষ কথা লিখেছেন টি এ এলিয়ট,—

"There is no Poet of any tongue, not even Latin or Greek who stands so firmly as a model for all Poets."

জোন অব আর্কের বিচার

পনের দিন ধরে ষাটজন বিচারক মিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেরা করেছিল সেই আঠারো উনিশ বছরের মেয়েটিকে। তার স্বপক্ষে কেউ ছিল না, না একটা উকিল, না কোনো পরামর্শদাতা। জোন অবশ্য বলেছিল, তার স্বপক্ষে আছেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর প্রেরিত সন্তগণ। সে যাই হোক, অতগুলি বিচারকের সামনে জোন একটুও বিচলিত হয়নি, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের মত তার প্রত্যেকটি উত্তর দ্বিধাহীন এবং স্পষ্ট। বিচারকদের মধ্যে পাঁচজন সেই মামলার বিবরণ ল্যাটিন ভাষায় লিখে রেখেছিলেন—তার মধ্যে তিনটি বিবরণ এখনও পাওয়া যায়! জোনের বিস্ময়কর জীবনকাহিনী সারা পৃথিবীর শিক্ষিত লোক মাত্রেরই কিছুটা জানা। কিন্তু বিচারকদের সম্মুখে তার জবানবন্দীও খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যেখানে বিচারকেরা সকলেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত কিম্বা গীর্জার ধর্মযাজক, সেখানে জোন অব্ আর্ক সামান্য অশিক্ষিত একটি বালিকা মাত্র।

জোনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, সে মোটেই ঈশ্বর আদিষ্টা নয়, সে মায়াবিনী, ডাকিনী, পিশাচসিদ্ধা। সে গীর্জার কর্তৃত্ব মানে না। সে পুরুষের পোষাক পরে। সে ব্যভিচারিণী, অসতী।

শেষ অভিযোগটা অবশ্য একেবারেই টেঁকেনি; কারণ কয়েকজন মহিলা তার শরীর পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—তাঁর মধ্যে জোনের প্রধান শাস্তিদানকারীর স্ত্রী ডাচেস্ অব বেডফোর্ডও ছিলেন—এবং তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, জোন সন্দেহাতীতভাবে কুমারী।

জোনকে মায়াবিনী ভাবার কারণ আছে। যে-কোন প্রতিভাবান মানুষই মায়াবী ও অলৌকিক। জোনের কার্যকলাপ সত্যিই ব্যাখ্যার অতীত। কোনরূপ যুদ্ধ পরিচালনার জ্ঞান তার ছিল না, নিতান্ত সাধারণ এক গ্রাম্য বালিকা। তবু কি করে নিপুণভাবে সৈন্য পরিচালনা করে অমন দুর্ধর্ষ ইংরেজবাহিনীকে পরাজিত করেছিল ভাবতে অবাক লাগে! পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ইংরেজরা ফরাসী দেশ প্রায় জয় করে নিয়েছিল। বার্গাণ্ডির ফরাসী ডিউক এবং বেডফোর্ডের ইংরেজ ডিউক, এই দুজনে মিলে ষষ্ঠ চার্লসের পুত্র ডফিনকে সরিয়ে ইংলণ্ডের নাবালক রাজা ষষ্ঠ হেনরীকেই ফ্রান্সের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। ডফিনের প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা ছিল

না।—তিনি ক্রমাগত যুদ্ধে পিছু হঠে আসছিলেন। এই সময় জোন হঠাৎ একদিন ডফিনের রাজসভায় এসে বলে, সে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা হতে চায়। ঈশ্বরের দূত তার ওপরেই ফ্রান্সকে মুক্ত করার ভার দিয়েছেন। তখন যুবরাজ ডফিনের আর কোনই আশা ছিল না, কোন অবিশ্বাস্য কিংবা অলৌকিক উপায়েই হয়তো শেষ চেষ্টা করা যায়, এ হিসেবে সেই মেয়েটির কথাতেই তিনি সম্মত হয়েছিলেন! ফল হল অকল্পনীয়।

অল্পদিনেই জোন ইংরেজদের অরলিয়েন্স-অবরোধ ভেঙে ফেললেন। একের পর এক শহরগুলি পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন। তাঁর সেই মহিমাময়ী মূর্তি দেখে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের চিহ্ন দেখা দিল—তাদের বিশৃঙ্খল করে দিল। প্রাচীন রেইম শহরে জোন এসে যুবরাজ ডফিনকে রাজা সপ্তম চার্লস হিসেবে অভিষিক্ত করলেন।

চোদ্দশো তিরিশ সালের মে মাসে জোন বার্গাণ্ডির ফরাসী ডিউকের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁকে তারা ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে।

সেই সময় ফ্রান্সের ধর্মচর্চা এবং ধর্মবিশ্বাস পরিচালনার কেন্দ্র ছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়—এবং এই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল খুব ইংরেজ-সমর্থক। ইংরেজরা তাদের সৈন্যদের মনে জোর ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, জোন একটি ডাকিনী, সে যে-উপায়ে ফরাসীদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে তা অপবিত্র, অমঙ্গলজনক উপায়। এইজন্য তারা বিচারের জন্য সাহায্য নিয়েছিল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্রধান বিচারক ছিলেন—বোভের বিশপ—যাঁর অধীনস্থ অঞ্চলেই জোন বন্দী হন। ফরাসী দেশের গৌরব সেই বালিকাটির জঘন্য অন্যায় বিচার করেছিল বিশ্বাসঘাতক ফরাসীরাই।

জোন এবং তাঁর বিচারকদের প্রশ্নোত্তর সংক্ষেপে এই :

প্রশ্ন। নাম, পদবী, জন্মস্থান, বয়েস, বাবা এবং মায়ের নাম কী?

জোন। আমার গ্রামে আমাকে বলে জানেৎ, ফ্রান্সে জান্। আমার পদবী জানি না। আমি ডমরেমি গ্রামে জন্মেছি। আমার বাবার নাম জাক্ অব আর্ক, মায়ের নাম ইসাবেল, আমার বয়েস, খুব সম্ভবতঃ উনিশ।

প্রশ্ন। তুমি ছেলেবেলায় কিছু কাজ শিখেছ কি?

উত্তর। হ্যাঁ, আমি সুতো কাটতে এবং সেলাই করতে শিখেছি। রুয়াঁ-তে আমি সুতো কাটা কিংবা সেলাই-এ কোন মেয়েকেই ভয় করি না।

প্রশ্ন। (লিখিত নেই)।

উত্তর। তের বছর বয়সের সময় আমার সাহায্য এবং নির্দেশের জন্য প্রথম ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। প্রথমবার শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। তখন ছিল গ্রীষ্মের দুপুর। আমার ডান পাশে গীর্জার দিকে আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনি। সেই দিকে একটা আলোও ফুটে উঠেছিল। সাধারণতঃ খুব তীব্র আলো···

প্রশ্ন। শেষ কবে তুমি সেই আওয়াজ শুনেছ ?

উত্তর। আমি সেই কণ্ঠস্বর কালও শুনেছি, আজও শুনেছি।

প্রশ্ন। কাল সকালে যখন তুমি এই কণ্ঠস্বর শুনেছ, তখন তুমি কি করছিলে ?

উত্তর। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, সেই স্বর আমাকে জাগিয়ে তুললো।

প্রশ্ন। তোমার হাত ধরে জাগালো ?

উত্তর। আমাকে স্পর্শ না করেই জাগিয়েছিল।

প্রশ্ন। তুমি কি তখন হাঁটু মুড়ে বসে ধন্যবাদ দিলে ?

উত্তর। হ্যাঁ, আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। আমি বসেছিলাম বিছানার উপরে, আমি দুই হাত যুক্ত করে তাঁর সাহায্য চাইলাম। সেই স্বর আমাকে বললো, তুমি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিয়ে যাও, ঈশর তোমাকে সাহায্য করবেন। (হঠাৎ বোভের বিশপের দিকে ফিরে) আপনি বলছেন, আপনি আমার বিচারক। আপনি যা করছেন, তার জন্য সাবধান, কারণ একথা নিশ্চিত যে, ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন। তোমার সঙ্গে যারা কথা বলেছে তারা কি কোন দেবদূত, না সন্ত, না ঈশ্বর স্বয়ং ?

উত্তর। সেই স্বর দেবদূত মাইকেল এবং সন্ত ক্যাথরিন ও সন্ত মার্গারিটের।

প্রশ্ন। তুমি এই সকলকেই সশরীর এবং বাস্তবে দেখেছ ?

উত্তর। আমি তাঁদের নিজের চোখে দেখেছি, যেমনভাবে আমি আপনাদের দেখছি। তাঁরা যখন চলে যান তখন আমি কাঁদি, আমি চাই তাঁরা যেন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

প্রশ্ন। সন্ত মাইকেলকে দেখতে কি রকম ?

উত্তর। আপনারা আমার কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাবেন না। একথা বালকরাও জানে যে, অনেক সময় সত্যি কথা বললেও কারুর কারুর ফাঁসি হয়।

প্রশ্ন। যারা তোমার কাছে আসে তারা স্ত্রী কি পুরুষ কি করে বুঝতে পারো?

উত্তর। আমি তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারি। তাঁরা আমার কাছে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেন, আমি তাই বুঝি, আমি ঈশ্বরের প্রকাশ এবং আদেশ ছাড়া আর কিছু জানি না।

প্রশ্ন। সন্ত মার্গারিট কি ইংরেজিতে কথা বলেন না?

উত্তর। কেন তা বলবেন, যখন তিনি ইংরেজদের মধ্যে নেই!

প্রশ্ন। সন্ত মাইকেল কিভাবে তোমার কাছে আসেন, নগ্ন হয়ে?

উত্তর। আপনারা কি মনে করেন, ঈশ্বর তাঁকে পরিধানের বস্ত্র দিতে পারেন না।…

প্রশ্ন। তুমি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছ—একথা বোঝাবার জন্য রাজাকে (তখন যুবরাজ) তুমি কি চিহ্ন দেখিয়েছিলে?

উত্তর। একজন দেবদূত যুবরাজকে রাজমুকুট এনে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং আমার চেষ্টায় তিনিই ফ্রান্সের অধিপতি হবেন।

প্রশ্ন। সেই মুকুট কিসের তৈরি ছিল?

উত্তর। সেটা ছিল স্বর্ণমুকুট। সেটি এতই মূল্যবান যে, আমার কণ্ঠে তার মণিমুক্তা কিংবা সৌন্দর্যের বর্ণনা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন। সেই দেবদূত আকাশ থেকে অথবা মাটি ফুঁড়ে এসেছিল?

উত্তর। আকাশ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন, শয়তানের কাছ থেকে নয়।

প্রশ্ন। দেবদূতেরা তোমাকে কখনও চিঠি লিখেছেন?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তুমি সন্ত ক্যাথরিন কিংবা মার্গারিটকে কখনো চুম্বন কিংবা আলিঙ্গন করেছ?

উত্তর। হ্যাঁ। তাঁদের শরীর থেকে আমি উত্তাপ এবং সুগন্ধ পেয়েছি।

প্রশ্ন। তুমি কোন্ জায়গায় চুম্বন করেছিলে, মুখে না পায়ে।

উত্তর। তাঁদের পদচুম্বন করাই সম্মান এবং সম্ভ্রমপূর্ণ।

প্রশ্ন। তুমি কি ঠিক জানো, তুমি ঈশ্বরের করুণায় আছ কি না?

উত্তর। যদি আমি না থাকি, তবে ঈশ্বর যেন আমাকে সেখানে নিয়ে যান। যদি আমি থাকি তবে ঈশ্বর যেন আমাকে সেখানেই চিরকাল রাখেন। আমি এই পৃথিবীর সকলের চেয়ে দুঃখী এবং হতভাগ্য হব, যদি

আমি জানতে পারি আমি ঈশ্বরের করুণায় নেই। কিন্তু যদি আমি পাপী হই—তবে কি তিনি দেবদূতদের আমার কাছে পাঠাতেন? আমার ইচ্ছা হয়, পৃথিবীর সকলেই যেন সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

প্রশ্ন। তোমার কি মনে হয়, সন্ত ক্যাথরিন এবং সন্ত মার্গারিট ইংরেজদের ঘৃণা করেন?

উত্তর। ঈশ্বর যা ভালবাসেন তাঁরাও তাই ভালবাসেন, ঈশ্বর যা ঘৃণা করেন তাঁরাও তা ঘৃণা করেন।

প্রশ্ন। ঈশ্বর কি ইংরেজদের ঘৃণা করেন?

উত্তর। ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন কিংবা ঘৃণা করেন, তা আমি জানি না। তবে আমি জানি, ঈশ্বর চান যে, তারা ফরাসী দেশের বাইরে চলে যাক।

প্রশ্ন। তোমার কি এমন বিশেষ গুণ আছে, যার জন্য ঈশ্বর অন্য কারুকে পছন্দ না করে তোমার কাছেই দেবদূত পাঠালেন।

উত্তর। হয়ত ঈশ্বরের এই অভিপ্রেত ছিল যে, একজন সামান্য কুমারীকে দিয়েই তিনি ফ্রান্সের শত্রুদের বিতাড়িত করবেন।

প্রশ্ন। অর্লিয়েন্সের যুদ্ধে তোমার কি কোন পতাকা বা ধ্বজা ছিল? কি রঙের?

উত্তর। আমার একটি সাদা পতাকা ছিল। চারপাশে লিলি ফুল, মধ্যখানে পৃথিবী, দু-পাশে দুই দেবদূত, উপরে সিল্কের অক্ষরে লেখা 'যীসাস্ মারিয়া!'

প্রশ্ন। তোমার তরবারি অথবা তোমার পতাকা—কোনটিকে তুমি বেশী মূল্য দাও?

উত্তর। তরবারির চেয়ে পতাকা অনেক শ্রেষ্ঠ, চল্লিশ গুণ শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের সময় আমার হাতেই পতাকা থাকতো, যাতে অন্য কেউ নিহত না হয়। আমি আজ পর্যন্ত কারুকে হত্যা করিনি।

প্রশ্ন। যুদ্ধের সময় দৈব নির্দেশ ছাড়াও কি কোন কাজ করোনি?

উত্তর। এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি, খাতা খুলে দেখুন। আমি যখন যা কিছু করেছি সবই ঈশ্বরের নির্দেশে।

প্রশ্ন। তুমি কি জানো, তোমার দলের লোকেরা তোমার জন্য পূজো দিয়েছে, প্রার্থনা করেছে।

উত্তর। না, জানি না। পূজো নিশ্চয়ই আমার হুকুমে হয়নি। তবে তারা আমার জন্য যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকে, তবে তাতে আমি কোন দোষ দেখি না।

প্রশ্ন। তুমি কি মেয়েদের পোশাক পরতে রাজী আছো?

উত্তর। যদি পোশাক পরলে আমি মুক্তি পাই, তবে দিন। না হলে চাই না। আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট—কারণ ঈশ্বরও তাতে সন্তুষ্ট।

প্রশ্ন। তোমার কি মনে হয় পুরুষের পোশাক পরা তোমার পক্ষে আইন-সঙ্গত?

উত্তর। আমি যা করেছি, ঈশ্বরের নির্দেশেই করেছি। যদি অন্য কিছু পরলে ভাল হত, তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে সেই নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন। পুরুষের পোশাক পরিধানের বদলে তুমি ঈশ্বরের কাছে কোন সুবিধা চাও?

উত্তর। এই পোশাকের জন্য, এবং যা-কিছু আমি করেছি—তার কোন প্রতিদান চাই না। আমি চাই আত্মার মুক্তি।

প্রশ্ন। তুমি একবার বলেছো, অনেক সময় সত্যি কথা বলার জন্য মানুষের ফাঁসি হয়। তুমি কি তাহলে নিজের এমন কোন অন্যায় বা পাপের কথা জানো, যা স্বীকার করলে তোমার মৃত্যু হবে?

উত্তর। আমি জ্ঞানতঃ কোনো পাপ করিনি কখনও।

প্রশ্ন। তুমি কি চার্চের বিচার মেনে নেবে?

উত্তর। আমি ঈশ্বরকে মানি, যিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি মাতা মেরীকে মানি। স্বর্গের সমস্ত দেবতা এবং সন্তদের। আমার মতে ঈশ্বর এবং গীর্জা একই—এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আপনারা কেন প্রভেদ ঘটাচ্ছেন?

প্রশ্ন। তোমার কথা অথবা কাজের জন্য, ভালো বা মন্দ যাই হোক, তুমি কি গীর্জার বিচার মেনে নেবে? বিশেষতঃ, তোমার আপত্তিকর ব্যবহার, অন্যায় কিংবা পাপের যে অভিযোগ এই আদালতে আলোচনা করা হল, সে সম্বন্ধে গীর্জার বিচার কি তুমি মেনে নিতে রাজী আছো?

উত্তর। অসম্ভব কোন নির্দেশ না দিলে নিশ্চয়ই মেনে নেবো। তবে এ কথা আমি কিছুতেই ঘোষণা করবো না যে, আমি যা করেছি বা করতে পেরেছি, কিংবা দিব্যদর্শন সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তার কোনোটাই ঈশ্বরের নির্দেশ নয়। আমার দৈব নির্দেশের বিরুদ্ধে যদি গীর্জা থেকে কিছু করতে বলা হয়, তবে আমি তা মানবো না, না, কিছুতেই মানবো না!

প্রশ্ন। যদি গীর্জা থেকে বলা হয়, তোমার দিব্যদর্শন নিতান্ত জালিয়াতি বা পৈশাচিক কাণ্ড, তবে কি তুমি গীর্জাকে অমান্য করবে?

উত্তর। যদি গীর্জা আমাকে বিপরীত কথা বলে তবে আমি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই আত্মসমর্পণ করবো, আর কারুর কাছে নয়।

প্রশ্ন। তুমি কি মনে করোনা যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হল গীর্জা অর্থাৎ প্রভু পোপ, কার্ডিনাল, আর্চ-বিশপ এঁরা। এবং তুমি এঁদের অধীন।

উত্তর। হ্যাঁ, আমি মনে করি আমি এঁদের অধীন। কিন্তু ঈশ্বর সকলের উপরে।

প্রশ্ন। তাহলে তোমার 'দৈব নির্দেশ' কি বলে যে তুমি গীর্জার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না বা গীর্জার বিচার মেনে নেবে না?

উত্তর। আমি নিজের থেকে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিইনি। যা কিছু বলেছি সবই দৈব নির্দেশ। তাঁরা আমাকে বলেন নি গীর্জাকে অমান্য করতে। কিন্তু ঈশ্বরই সর্ব প্রথম মান্য।

...এই-ই বিচার। কিন্তু এর ফলেই হল চরম শাস্তি। বুঝি বা সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নেওয়া ছিল। তাঁর সম্বন্ধে বলা হল, তুমি একটা ডাকিনী, ধর্মহীনা এবং ধর্মবিদ্বেষী—যে গীর্জার কর্তৃত্ব মানে না সে নীতিহীনা। সে সুরুচি এবং শোভনতা না মেনে পুরুষের পোশাক এবং অন্তর্বাস পরে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারিণীর অভিযোগ চক্ষু লজ্জার খাতিরেই শেষ পর্যন্ত চাপানো যায়নি। জোনের উপর আদেশ হল, 'তুমি যদি তোমার দৈববাণীকে অস্বীকার না করো তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে।'

জোন দৈববাণী অস্বীকারের বদলে মৃত্যুই বেছে নিলেন। কিন্তু যেদিন তাঁর মৃত্যুর দিন স্থির হয়েছিল সেদিন মৃত্যু হয়নি। সেদিনের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে জোন অব আর্ক ঈশ্বরানুগৃহীত হোন বা না হোন তিনি ছিলেন একজন রক্ত মাংসের মানুষ। তাঁর শরীর আছে, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আছে। তিনি ডাকিনী নন, মানুষই আদর্শের জন্য জীবন দিতে পারে—আবার ভুল করাও মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

মাঠের মধ্যে জনসাধারণের সামনে তাঁকে উঁচু জায়গায় দাঁড় করানো হল। উজ্জ্বল, নিষ্পাপ একটি উনিশ বছরের যুবতী। অসাধারণ রূপসী ছিলেন জোন, তাঁর মুখ ছিল মহিমামণ্ডিত—যা দেখলেই তাঁর প্রতি সাধারণ লোকের একটা অদ্ভুত টান জন্মাতো। সেই যুবতীকে এখনই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। পৃথিবীর কিছুই তাঁর ভোগ করা হল না। যদি তাঁর 'দৈব নির্দেশ' নিতান্ত ভুল ধারণাও হয়, তবুও তাঁকে পুড়িয়ে মারা অকল্পনীয় বর্বরতা।

যখন তাঁর গায়ে আগুন লাগাবার জন্য মশালটা এগিয়ে এলো, ভয়ে

চিৎকার করে উঠলেন জোন অব আর্ক। সেই ভয়ংকর আগুন থেকে নিমেষের মধ্যে চলে গেল অপার্থিব ভরসা, কোথায় গেল সেই আদর্শে-ভর করা, সৈনিক-ত্রাস জোন, জেগে উঠলো একটি উনিশ বছরের রক্ত মাংসের মেয়ে, জ্বলে উঠলো তার নিজের বুকের আগুন। বেঁচে থাকার প্রবলতম ইচ্ছা তাকে ডুবিয়ে দিল। বাঁচাও, বাঁচাও, চেঁচিয়ে উঠলেন জোন। না-না, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও। আমার আর মনের জোর নেই। আমার 'দৈব নির্দেশ' আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—আমাকে বাঁচাও, আমি সব মেনে নেবো। গীর্জাকে মানবো, মেয়েদের পোশাক পরবো। বাঁচাও।

জ্বলন্ত মশালের সামনে বেঁচে ওঠার জন্য জোন ছটফট করতে লাগলেন।

তাঁকে তখন সেই বধ্যভূমি থেকে নামিয়ে আবার জেলে নিয়ে আসা হল, সেখানে তিনি মেয়েদের পোশাক পরলেন। পুরুষের পোশাকটা এক কোণে পড়ে রইলো। তখন জোনের সমস্ত শরীর কাঁপছে, যেন অসহায়ের মত তিনি কিছু একটা ধরবার চেষ্টা করছেন। মৃত্যুর কাছে এসে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের মনেও এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা এসেছিল।

তিনদিন কারাগারে রইলেন জোন। প্রচণ্ড আত্মপীড়নের তিনদিন। মৃত্যুকে দূরে সরাবার সাধ, বেঁচে থাকার গ্লানি। এখন মেয়েদের পোশাক পরে আছেন, যে পুরুষের পোশাক নিয়ে অত কথা উঠেছিল আজ সেটা খুলে রেখেছেন পায়ের কাছে। আজ জোন একটি যুবতী।

পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি কিছুই পাননি। অতীতের সমস্ত গৌরব তুচ্ছ করে তিনি কি বেঁচে থাকবেন শুধু সুখ সম্ভোগের জন্য!

তিনদিন বাদে তিনি পুরুষের পোশাকটা আবার তুলে নিয়ে পরলেন, এবং বললেন, কারাবাসের বদলে তিনি চরম প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ মৃত্যু চান। সেদিন তিনি ভয় পেয়ে দৈববাণীকে অস্বীকার করে খুবই অন্যায় করেছেন। 'ওর ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে অস্বীকার করিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ঈশ্বরের কখনো বিরুদ্ধাচরণ করিনি।'

আসলে জোন প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁকে সত্যিই পুড়িয়ে মারা হবে। এমনই নিষ্পাপ ছিল তাঁর মন। ফলে মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে সময় পাননি। এবার আবার মনে ফিরে এলো পূর্বের সাহস, মৃত্যুভয়কে জয় করার আনন্দ।

জোনকে আবার ডাকিনী বলে ঘোষণা করা হল এবং ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হল। হাত পা বাঁধা অবস্থায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন

জোন—পায়ের তলা থেকে উঠে এলো আগুনের শিখা, দপ করে জলে উঠলো চুল—থাক্, সে মৃত্যু বর্ণনা না করাই ভালো, জোন শান্ত আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন।

জোন অব আর্কের স্বপ্ন-সাধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থাকেনি। তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরই ইংরেজরা ফরাসী দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ক্যালিক্সটাস্ জোন অব আর্কের পুনর্বিচারের আদেশ দেন। নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল তার বিরুদ্ধে মিথ্যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে। বোভের বিশপ, যিনি ছিলেন জোনের হত্যাকারীদের পাণ্ডা, তাঁর দেহ কবর থেকে তুলে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত, মাত্র এই ১৯২০ সালে জোন অব আর্ককে একজন খ্রীষ্টীয় সন্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সন্ত ক্যাথারিন এবং সন্ত' মার্গারিট যাঁরা ছিলেন জোনের অত্যন্ত প্রিয়—এখন তাঁদের পাশে সন্ত জোনের স্থান।

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস

তৃতীয়বার অভিযানের পর যখন স্পেনে ফিরে এলেন কলাম্বাস, তখন তিনি বন্দী। সমুদ্র-উপকূলে এসে জাহাজের ডেকে তিনি দাঁড়িয়েছেন, হাত পায়ে শিকল বাঁধা। কান্নায় তাঁর বুক ফুলে উঠছে। জাহাজঘাটে একটি লোকও আসেনি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। শুধু এসেছে প্রহরীরা। কলাম্বাসের মনে পড়ল আট বছর আগে একদিনের কথা। যেদিন তিনি প্রথমবার অভিযান শেষ করে ফিরেছিলেন। ইওরোপের জন্য তিনি এক নতুন ভূখণ্ড, নতুন দেশ আবিষ্কার করে এসেছেন। সেদিন সমগ্র স্পেনের লোক ভেঙে পড়েছিল বন্দরে, শুধু তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য। ঘন ঘন কামান গর্জে উঠেছিল, রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি। বিজয়ীর গর্বে দাঁড়িয়ে সেদিন কলাম্বাস ইওরোপের অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন। আজ তিনি নিঃসঙ্গ, শৃঙ্খলিত। রাজদ্বারে অভিযুক্ত। যে রাজা রাণী তাঁকে অফুরন্ত সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছিলেন—আজ তাঁরাই তাঁকে বন্দী করে এনেছেন। দীর্ঘদেহী কলাম্বাস দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজের ডেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর।—অত্যন্ত আবেগ প্রবণ ছিল তাঁর মন—অভিমানে এবং অপমানে তাঁর বুক ফুলে উঠছে।

কলাম্বাসের জীবনে এমন বহু উত্থান পতন এসেছে। তার চরিত্রে বিপদের ছোঁয়াচে রোগ ছিল। বারবার তাঁর রক্তে এক অনির্দিষ্ট ডাক এসে পৌঁছুতো, যাকে বলা যায় সুদূরের আহ্বান। বিশাল নীল জলরাশি ভেদ করে কোথায় কোন অজানা দেশে পৌঁছবেন—এ জন্য তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতো। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, সমুদ্রের পাড়ে একা বসে আছেন কিশোর কলাম্বাস, উদাস মুখ, সমুদ্রের অকূলের দিকে তাঁর চোখ স্থির নিবদ্ধ, যেন দিগন্তের ওপারের কোনো অজানা ছবি তাঁর মনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে। ঐ দিগন্তের ওপারে যাবার জন্য বারবার তিনি বিপদে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

আজকের মানুষ মহাশূন্যে অভিযান শুরু করেছে—কিন্তু এর তুলনায় অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়াও কলাম্বাসের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় ছিল না। সেই সময়, যখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল এই যে পৃথিবী একটা চৌকো সমতল জায়গা। অনেক দূর ঘোড়া ছুটিয়ে বা জাহাজ চালিয়ে গেলে হঠাৎ এক সময় গড়িয়ে নরকে পড়ে যাবে। বিশেষ কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল

না কলাম্বাসের—কিন্তু তবু তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটি মহাদেশ,—আমেরিকা। সভ্য জগতকে পথ দেখিয়েছিলেন যে মহাদেশের, আজ যে মহাদেশ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, অতবড় একজন আবিষ্কারকের একটি প্রামাণ্য ছবি পর্যন্ত আজও পাওয়া যায় না। জন্ম তারিখ নিয়েও দ্বিধা। মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গী ছিল অল্প কয়েকজন পুরোনো বন্ধু এবং নিজের দীর্ঘশ্বাস।

যতদূর জানা যায় কলাম্বাস জন্মেছিলেন ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, জেনোয়া শহরে। বাবা ছিলেন তন্তুবায়, সেইজন্যই প্রাচ্যদেশের, বিশেষত ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম বস্ত্রের সুনামের কথা জানা ছিল, আরও শুনেছিলেন দূর প্রাচ্যের সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি নানান্ মশলা-পাতির এবং দারুচিনি দ্বীপের কথা। ছেলেবেলা থেকেই ম্যাপে বা ভূ-গোলকে ঐ সব স্বপ্নের দেশে যাবার পথের কথা ভাবতেন।

যুবা বয়সে কলাম্বাস ইতিহাস, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি অধ্যয়ন শেষ করে, নৌ-যুদ্ধ বিভাগে যোগ দিলেন। অবসর সময়ে তিনি ম্যাপ বানিয়ে বিক্রি করতেন। এই ম্যাপ বানাবার অভ্যাস তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিল পরে। মানচিত্রের অর্থহীন রেখার মধ্যে নিরবয়ব দেশগুলি আহ্বান করতো তাঁকে, রক্তের মধ্যে যেন অবিরাম শুনতে পেতেন সমুদ্রের গর্জন।

লিসবনে এসে এক বিখ্যাত নৌ-কর্মচারীর মেয়েকে বিয়ে করলেন। এর আগে পর্যন্ত কলাম্বাস কখনো জোর দিয়ে ভাবেন নি, জীবনে তিনি কি করতে চান। সমুদ্র ভ্রমণ এবং দিগন্তের ওপারে যাবার শখ ছিল, এই পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহের পর, তাঁর জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। নিশানাহীন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে যাবার পথ আবিষ্কার করবেন—এই হল তাঁর জীবনের একমাত্র অভীষ্ট। এর কারণ, কলম্বাসের শ্বশুর মহাশয় ছিলেন অভিজ্ঞ নাবিক, বহু সূক্ষ্ম মানচিত্র এবং সমুদ্র অভিযানের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল তাঁর। এছাড়া তিনি ভারতবর্ষ এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের একটি বর্ণনা লিখেছিলেন—এবং তা পড়ে কলাম্বাসের আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হয়।

গ্লোবের উল্টোপিঠেই আছে পূর্ব এশিয়া, এই ছিল কলাম্বাসের ধারণা, এবং সেখানে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তখন বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল ইওরোপের—কিছু আরবীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে স্থলপথে। ইওরোপের প্রত্যেকটি দেশ তখন চেষ্টা করছিল জলপথে একটি সহজ যোগাযোগের উপায় খুঁজে বার করতে। পর্তুগীজরা বারবার চেষ্টা করেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকুল ঘুরে ভারতবর্ষে

পৌঁছবার (এবং শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছিল তারাই।) কলাম্বাসের ধারণা আরও সংক্ষিপ্ত পথ আছে।

তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরতে লাগলেন রাজদ্বারে দ্বারে। প্রথমে গেলেন জেনোয়ায়। উপহসিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর পর্তুগালে। না। ইংলণ্ডে গেলেন—তখন ইংলণ্ডের সম্রাট ছিলেন ৭ম হেনরী, তিনি কর্ণপাত করলেন না। কলাম্বাসের মন ভেঙে পড়ছিল—তবু সম্পূর্ণ নিরাশ না হয়ে এলেন স্পেনে।

স্পেনে কলাম্বাসকে দীর্ঘ আট বছর কাটাতে হয়েছে উমেদারি করে। স্পেনের রাজা-রানী ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা কখনও সম্পূর্ণ না বলেন নি, বিশেষত রানা ইসাবেলা, উৎসাহই দেখাচ্ছিলেন কিন্তু শর্তে মিলছিল না। জীবন বিপন্ন করে কলাম্বাস যে নতুন দেশে যাবেন—সে দেশের রাজপ্রতিনিধি করতে হবে তাঁকে এবং রাজস্বের অংশ দিতে হবে—এই ছিল কলাম্বাসের দাবি। কিন্তু রাজা এবং রাজসভা সাহায্য করতে রাজী হলেন না।

ততদিনে কলাম্বাসের পত্নী বিয়োগ হয়েছে, সমূখে এসেছে দারিদ্র্য। পাওনাদারেরা মানচিত্র এবং যন্ত্রপাতিগুলি কেড়ে নিয়েছে ঋণের দায়ে। সংশয়ে ব্যর্থতায় তিনি প্রায় ভেঙে পড়ছেন। একদিন স্পেনের এক পাদরী দেখলেন—কলাম্বাস পোঁটলা-পুটলি বেঁধে বিদেশে যাত্রার চেষ্টা করছে। কোথায় যাচ্ছেন?—জিজ্ঞেস করলেন সেই পাদরী।—'প্যারিসে,' কলাম্বাস উত্তর দিলেন, 'দেখি ফরাসী দেশের সম্রাটের এই সামান্য দূরদৃষ্টিটুকু আছে কিনা, যা অন্য কোনো রাজাদের দেখছি না।'

শেষ পর্যন্ত এ লোকটা দেশান্তরী হবে? পাদরী ভাবলেন। যদি ওঁর পরিকল্পনা কখনও সত্য হয়, তবে সে কৃতিত্বের গৌরব স্পেন পাবে না। তিনি কলাম্বাসকে বললেন, আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি রানীকে আর একবার বলে দেখি। ঐ পাদ্রী ছিলেন রানীর কনফেসর অর্থাৎ রানী ওঁর কাছে স্বীকারোক্তি দিতেন। তিনি গিয়ে রানীকে বললেন, কলাম্বাসের যে পরিকল্পনা সেটা কার্যকর করতে যা খরচ তা একটা রাজ্যের পক্ষে এমন কিছুই নয়—কিন্তু সফল হলে প্রতিদান পাওয়া যাবে প্রচুর। তাছাড়া, নব আবিষ্কৃত দেশের মানুষকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে। রানী ভেবে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ কলাম্বাসকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানালেন। সেই সঙ্গে কিছু অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দিলেন—যাতে কলাম্বাস তাঁর ঘোড়া, জামাকাপড়গুলো বদলে নতুন, রাজসভায় উপযুক্ত পোশাক পরে আসতে পারেন।

রানীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। 'আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত' রানী বললেন ! এ কথা বলে একটুক্ষণ থামতে হল তাঁকে, তাঁর মনে পড়লো, রাজা ফার্দিনান্দ এ প্রস্তাবকে সুনজরে দেখেন না। তাছাড়া সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য—তাই একটুক্ষণ থেমে রানী বললেন, 'যদি প্রয়োজন হয়, আপনার অভিযানের জন্য অর্থ আমি আমার নিজের অলংকার বন্ধক দিয়ে যোগাড় করবো'।—এই একটি কথার জন্য এই দূরদর্শিনী রানী ইসাবেলা ইতিহাসে উজ্জল আসন পেয়ে গেলেন।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট শুক্রবার পালোস বন্দর থেকে কলাম্বাস তাঁর দলবল নিয়ে শুভযাত্রা করলেন। তিনটে ছোট জাহাজ 'পিণ্টা', 'নিনা' এবং 'সাণ্টা মেরিয়া'—সর্বসমেত ১২০ জন লোক। জাহাজঘাটে যারা বিদায় দিতে এসেছিল—তারা চোখের জল ফেলছিল এই ভেবে যে, হায় হায়, ঐ লোকগুলো আর কোনদিন ফিরবে না। ওরা স্বেচ্ছায় সর্বনাশের মধ্যে যাচ্ছে।

একুশ দিন ধরে অবিরাম জাহাজ ছুটলো পূর্ব দিকে। কোথাও আর কিছু নেই। মাথার উপরে এবং জাহাজের নিচে দুটি নীল সমুদ্র। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি, ঢেউয়ের বিদ্রোহ। অনেক দুর্ধর্ষ নাবিক সমুদ্রকে ভয় করে না—কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা জানতে না পারলে বা কোনদিনই কোথাও পৌঁছুবো কিনা, এই সন্দেহ থাকলে ভয় আসেই। অধিকাংশ মাল্লাই অশিক্ষিত, পৃথিবীর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তারা অস্থির হয়ে একদিন বিদ্রোহ করতে চাইলো। 'ফিরে যেতে হবে' এই রব তুললো তারা। কলাম্বাস সান্ত্বনা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগ করে সামলাতে লাগলেন তাদের।

হঠাৎ দেখলেন একটা গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে। 'গাছ' 'গাছ' সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, নিশ্চয়ই কাছে কোথাও মাটি আছে ; হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জাহাজে জাহাজে। একটি পাখি উড়ে যাচ্ছে। 'পাখি পাখি' সবাই চেঁচিয়ে উঠলো। কলাম্বাস হুকুম দিলেন ঐ উড়ন্ত পাখির পিছু পিছু জাহাজ চালাতে, খানিকটা বাদে হঠাৎ যেন পাখিটা মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন মাঝ রাত্রে যেন একটা আলো দেখলেন দূরে। পরদিন আবার কিছু নেই কোথাও। তবে বোধহয় ওগুলো মায়া, মৃত্যুর আগেই মানুষ এসব ভোজবাজি দেখে। নাবিকদের মধ্যে আবার অসন্তোষের গুঞ্জরণ ছড়িয়ে পড়লো। কলাম্বাস ঘোষণা করলেন, যে আগে স্থলভূমি দেখতে পাবে তাকে বিরাট পুরস্কার দেওয়া হবে। আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল—চতুর্দিকে চাপা উত্তেজনা, ঢেউয়ের শব্দ যেন ইয়ার্কির সুরে কি সব বলাবলি করছে।

১২ তারিখে রাত দুটোর সময় পিণ্টা জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠলো। অন্য জাহাজ থেকে কলাম্বাস চমকে উঠলেন, তবে কি নাবিকদের বিদ্রোহ? সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হৈ-চৈ শোনা গেল, স্থল দেখা গেছে।

কলাম্বাস শান্তভাবে খ্রীষ্ট মূর্তির সামনে গিয়ে প্রার্থনা করলেন। হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছি। কবরে যাবার দিন পর্যন্ত কলাম্বাসের এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি ভারত আবিষ্কার করেছেন। সে দিন যে স্থলভাগ দেখলেন—সেটা ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক—অতএব ওখানকার নাম হল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ,—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ওখানকার অসভ্য অধিবাসীরাই ইণ্ডিয়ান। তিনি জেনে যাননি ভারতবর্ষ তার বিপরীত দিকে এবং সভ্যতায়, ঐশ্বর্যে তখন বলীয়ান।

পরদিন সকালবেলা কলাম্বাস সদলবলে দ্বীপে অবতরণ করে স্পেনের রাজার নামে পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং সেই দ্বীপের নাম দিলেন 'সান সালভাডর'। সেখানকার আদিবাসিদের কাছে তিনি সোনার সন্ধান করলেন—সামান্য জিনিসপত্র উপহার দিয়ে তাদের কাছ থেকে পেলেনও অনেক ভারী ভারী সোনার তাল। তারা হাত দিয়ে একদিক দেখিয়ে দিলো—সেখানে ঐ অদ্ভুত চকচকে জিনিসটার খনি আছে। কলাম্বাস দলবল নিয়ে ছুটলেন সেইদিকে। যাবার পথে আবিষ্কার হল কিউবা, হেইটি প্রভৃতি দ্বীপ। একটা জাহাজ ভেঙে গেল দুর্ঘটনায়। রসদও ফুরিয়ে এসেছে। এবার ফিরে না গেলে চলে না। স্বর্ণলোভী নাবিকদের মধ্যে ৩৯ জন সেখানেই থেকে যেতে চাইলো, ভাঙা জাহাজের কাঠ দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়ে তারা সেখানে রয়ে গেল—কলাম্বাস ফেরার পথ ধরলেন।

ফেরার পথে ভয়ংকর ঝড়, সমুদ্রের কি সংহার মূর্তি। কলাম্বাস ভাবলেন হয়তো আর ফিরতে পারবো না; সভ্য-জগতের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া যাবে না এই বিজয়বার্তা। ঐ তুমুল ঝঞ্ঝার মধ্যেও অবিচলিত কলাম্বাস একটা পার্চমেণ্ট কাগজে সংক্ষেপে লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তারপর সেটা একটা বোতলে ভরে জলে ফেলে দিলেন। যদি তাঁর মৃত্যুর পরেও কোন সভ্য মানুষের হাতে পড়ে।

সাড়ে ছ-মাস বাদে কলাম্বাস ফিরে এলেন স্পেনে। জামা কাপড় ছেঁড়া, জাহাজের ভগ্নদশা, কিন্তু চোখে মুখে জয়ের গৌরব। রাজা-রানী ছিলেন বার্সিলোনায়, কলাম্বাস তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যেদিন সেখানে পৌঁছুলেন—সমস্ত নগরী সেদিন উৎসবসজ্জায় সেজেছে তাঁকে অভ্যর্থনা

জানবার জন্য। রাজসভায় সিংহাসনের পাশেই তাঁর স্থান হল। আবিষ্কৃত দেশের নানা উপহার তিনি সামনে বিছিয়ে দিলেন—তারপর ভ্রমণের রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ করলেন—মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সকলে শুনতে লাগলো তাঁর কথা।

কলাম্বাস মানুষটি ছিলেন কবি স্বভাবের, তাঁর চরিত্র গাঢ় রঙে আঁকা। সামান্য কারণে হো হো করে হাসতেন, বিনা কারণে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তাঁর প্রতি সামান্য ভালবাসা দেখালে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কৃতজ্ঞ থাকতেন সারা জীবন—তাঁর জন্য বুকের সব জানালা খুলে দিতেন—আবার কেউ একটু অপমান করলেই মুষড়ে পড়তেন ভয়ানক, যেন ভোগ করতেন মৃত্যু যন্ত্রণা।

সেই বছরই তিনি দ্বিতীয়বার অভিযানে বেরুলেন। এবারে বিরাট বহর, দেড় হাজার লোক। যেখানে আগের বার বাড়ি তৈরী করে ৩৯ জন লোক রেখে গিয়েছিলেন, এসে দেখলেন, বাড়ি নেই, লোকজনও উধাও। আবার সেই হিসপানিওলায় কুঠি তৈরী করে নিজের ভাইকে তার ভার দিয়ে গেলেন। ইওরোপের বাইরে সেই প্রথম ইওরোপের উপনিবেশ। সেবার আবিষ্কার করলেন জ্যামাইকা। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ভাই কোনক্রমে হিসপানিওলা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ইওরোপীয়দের দুর্ব্যবহারে স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে কুঠি ভেঙে দিয়েছে। সেবার কলাম্বাস রাজা-রানীকে প্রচুর সোনা উপহার দিলেন—যা তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অভিযাত্রী নাবিকেরা এতে খুশী হল না। তারাও তো নিছক ভ্রমণের আনন্দের জন্য যায়নি, সোনা পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হবার জন্যই গিয়েছিল। সুতরাং তারা নতুন দেশ এবং কলাম্বাসের নিন্দে শুরু করে দিল।

এবার কলাম্বাসের পতন আসন্ন হয়ে এসেছে। খ্যাতি এবং সম্মানের উচ্চ শিখরে উঠেছেন—সুতরাং এবার তাঁর শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবেই। বিশেষত এই লোকটা বিদেশী, ইটালীর লোক ক্রিস্টোফার কলাম্বাস, তাঁর স্পেনে এত প্রতি-পত্তি অন্যের সইবে কেন? পাদ্রীরা অসন্তুষ্ট হলেন এই কারণে যে, কলাম্বাস নতুন দেশগুলিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না। কলাম্বাসের যুক্তি ছিল এই যে, নব অধিকৃত দেশগুলিতে আগে শৃঙ্খলা এবং শান্তি আনা দরকার—তার আগে ওসব করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

কলাম্বাস তৃতীয়বার অভিযানে বেরুলেন ১৪৯৮ সালের ৩০শে মে। এবার তিনিই প্রস্তাব করলেন, জেলখানার খুনে-গুণ্ডা-বদমাসদের সঙ্গে নিয়ে নতুন দেশগুলিতে কাজে লাগানো হোক। তাই দেওয়া হল। তাঁর বিরুদ্ধ-

পক্ষীয়রা গোপনে নৃত্য করেছিল এ সংবাদে। তিনি তিনটি জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন হিসপানিওলার দিকে—নিজে গেলেন অন্য দিকে। আবিষ্কার করলেন ত্রিনিদাদ। তারপর এক বিরাট ভূখণ্ডের সন্ধান পেলেন—যেটা নিশ্চিত কোনো মহাদেশ। কলাম্বাস সেই মহাদেশকে চিনতে পারেন নি, ভেবেছিলেন এশিয়ার অংশ। কিছুকাল পরে আমেরিগো ভেস্‌পুচি নামে একজন বিশেষজ্ঞ গিয়ে প্রমাণ করেন—সেটা এক নতুন মহাদেশ, তখন নাম দেওয়া হল সে মহাদেশের 'আমেরিকা'। কিন্তু সেখানকার আদি অধিবাসীদের নাম এখনও রয়ে গেছে রেড-ইণ্ডিয়ান।

এদিকে খুনে গুণ্ডার দলবল কলোনীগুলিতে অরাজকতা শুরু করবার চেষ্টা করলো। লুটপাটের চেষ্টা করে ক্ষেপিয়ে দিল আদিবাসীদের। কলাম্বাস তাড়াতাড়ি সেখানে বিদ্রোহ শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে দাস প্রথার প্রবর্তন করতে হল। আমেরিকার ঐ কুৎসিত প্রথার পত্তন সে সময়েই। একদল অনুচর ফিরে এলো স্পেনে এবং রটিয়ে দিল যে কলাম্বাস ওখানে স্বাধীন হয়ে রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিরুদ্ধ পক্ষীয়রা এই সংবাদে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল রাজাকে। মুক্তি পাওয়া গুণ্ডা বদমাসেরা তাদের প্ররোচনায় রাজবাড়ির সামনে এসে হৈ-হল্লা করতে লাগলো, আমরা মাইনে পাইনি, আমরা খাবার পাইনি, কলাম্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। রাজা প্রাসাদ থেকে বেরুচ্ছেন—তাঁর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ছুটতে লাগলো তারা।

এদিকে রাজাও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কলাম্বাসের সম্মান এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে তিনিও খুশী ছিলেন না। এক একটা নতুন দেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী সে সব দেশের ভাইসরয় হচ্ছে কলাম্বাস। একজন লোকের হাতে এত এত ক্ষমতা রাজার পক্ষে অস্বস্তির কারণ। রানী বরাবরই ছিলেন কলাম্বাসের সমর্থক। তিনি প্রথমটায় কলাম্বাসের নামে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করেন নি। একদিন রানী ইসাবেলা পথে দেখলেন, একটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রমণী, গর্ভিনী অবস্থায় বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। একি, আমার নতুন দেশের মেয়েদের একি অবস্থা ? তাঁকে বলা হল, কলাম্বাসের শাসনে ব্যভিচার, লাম্পট্য, বিশৃঙ্খলা এমন চরম যে, যেখানে প্রায় সব মেয়েরই এই অবস্থা। সেইদিনই রানী সোজা প্রাসাদে ঢুকে কলাম্বাসের বিরুদ্ধে তদন্ত বসাতে সম্মত হলেন।

ফ্রান্সেসকো ডি বোবাডিলা নামে একজন রাজপুরুষকে পাঠানো হল প্রচুর

ক্ষমতা দিয়ে। বোবাডিলা এই সঙ্কল্প নিয়েই গেলেন যে, ঐ উদ্ধত ইটালীয়ানটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। হিসপানিওলাতে এসেই তিনি তলব করলেন কলাম্বাসের ভাইয়ের। কলাম্বাস তখন সেখানে ছিলেন না, ছিলেন ফোর্ট কনসেপ্‌সনে। ভাই ডিয়েগো কলাম্বাস বললেন যে, দাদার অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে সম্মত নন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে এবং কলাম্বাসের ছেলেকে বন্দী করা হল। বোবাডিলা স্বয়ং কলাম্বাসের নিজের বাড়িতে এসে উঠে তাঁর কাগজপত্র তছনছ করে ফেললেন এবং কলাম্বাসের জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। তারপর কলাম্বাসকে সেখানে আসবার জন্য হুকুম পাঠালেন।

খবর শুনে কলাম্বাস স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি তখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। প্রথমে ভাবলেন বুঝি কোন ডাকাত তাঁর বাড়ি দখল করেছে। তারপর যখন রানীর শিলমোহর দেখলেন—তখন দারুণ অভিমানে তাঁর মন আপ্লুত হল। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দলের লোকেরা ঐ ধৃষ্ট রাজপুরুষের কথা শুনতে চায়নি, তারা প্রস্তাব করলো ঐ আদেশ অমান্য করার। 'আপনি হুকুম দিন স্যার, আমরা এক্ষুনি ঐ বদমাস বোবাডিলাটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছি। ওর দলবলকেও সাফ করে ফেলবো। ফিরে গিয়ে খবর দেবারও লোক থাকবে না'। কলাম্বাসের হাতে তখন এমন ক্ষমতা ছিল যে স্পেনের রাজার হুকুম তিনি অনায়াসেই অমান্য করতে পারতেন। এবং সেই সুদূর উপনিবেশ তাঁকে দমন করা খুব সহজ হত না। কিন্তু কলাম্বাস অনুরোধ করলেন তাদের নিবৃত্ত হতে। কলাম্বাস এসে বোবাডিলার সঙ্গে দেখা করলেন। বোবাডিলা কোনো রকম বাক্যব্যয় না করে তাঁকে নিক্ষেপ করলেন কারাগারে।

কারাগারে বন্দী হয়ে রইলেন ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। জুয়াচোর বদমাসদের মধ্যে স্বরাজ এসে গেল। তারা হৈ হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, মেয়েদের পথ থেকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলো ইচ্ছে মত, কলাম্বাসের নামে থুতু ছেটাতে লাগলো, অশ্লীল গালাগালি দিয়ে পোস্টার মারতে লাগলো দেয়ালে দেয়ালে। কারাগারে বসে কলাম্বাস সেই হট্টগোল শুনতে পেলেন। অবহেলিত ভাবে দিনের পর দিন সেই কারাগারে পড়ে থাকতে থাকতে কলাম্বাসের মনে দারুণ ভয় এলো। তাঁর মনে হল, কোনদিন তাঁর বিচার হবে না, কোনদিন তিনি নিজের কথা বলার সুযোগ পাবেন না, এইভাবেই এই অন্ধকার ঘরে তাঁকে পচে মরতে হবে। ভবিষ্যৎ যুগে তাঁর নামের সঙ্গে থেকে যাবে এই কলঙ্ক, অপবাদ।

কয়েকদিন বাদে একজন কর্মচারী ঢুকলো তাঁর কারাকক্ষে। তাকে দেখে

কলাম্বাস শিউরে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এবার তাঁকে ফাঁসি কাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ভিল্লেজো, ভিল্লেজো, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে এসেছ?

—আপনাকে জাহাজে নিয়ে যেতে এসেছি।

—জাহাজে? না, না। সত্যি কথা বলো।

—না, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে আমি জাহাজ করে স্পেনে নিয়ে যাব।

—সত্যি? ঠিক বলছো? কলাম্বাসের শরীর কাঁপছিল।

—হ্যাঁ, আমি শপথ নিয়ে বলছি। আপনার হাতের শিকল খুলে দেবো?

—না। রানীর আদেশে যখন শিকল পরানো হয়েছে তখন যদি খোলা হয় রানীর আদেশেই খোলা হবে। এই অপমানের শিকল আমি সারা জীবন রেখে দেবো চিহ্ন হিসেবে।

পরে সারা জীবন, কলাম্বাসের টেবিলের কাছে সেই শিকলটা ঝোলানো থাকতো। এবং কলাম্বাসের পুত্র লিখেছেন ঃ তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর কফিনের মধ্যেও যেন ঐ শিকলটা দিয়ে দেওয়া হয়।

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর শৃঙ্খলিত, অপমানিত কলাম্বাসকে নিয়ে আসা হল স্পেনে। ক্ষমতাচ্যুতি নয়, আকস্মিক অপমানেই তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি রানীর শিশুপুত্র ডন জুয়ানের ধাত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি আবার রানীর সামনে পড়া হল। প্রচণ্ড আবেগে দুঃখে লেখা সেই চিঠি। রানী বিচলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন কলাম্বাসের শৃঙ্খল মুক্ত করবার। এবং কলাম্বাসকে নিজের মর্যাদার পোশাকেই রাজসভায় হাজির হতে বললেন। সেখানে বিচার হবে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীর এমন সংক্ষিপ্ততম বিচার বোধ হয় ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। বাদী প্রতিবাদী কেউ একটিও কথা বললো না, বিচার শেষ হয়ে গেল। বিচার শুনলেই যে আইনের হাজার গ্রন্থি—উকিল সাক্ষীর কথা মনে পড়ে—সেদিক থেকে কলাম্বাসের বিচার চিরস্মরণীয়। রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু চোখ নিচের দিকে। একটুক্ষণ বাদে সোজা তাকালেন রানীর দিকে। নিজের জলভরা চোখ দিয়ে দেখলেন রানী ইসাবেলার চোখেও জল। সঙ্গে সঙ্গে কলাম্বাসের বুক কেঁপে উঠলো। তিনি রাজা-রানীর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, একটিও কথা বেরুলো

না। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে উচ্ছ্বসিত কান্নার সঙ্গে বললেন, 'আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি, 'আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি'।

সেই প্রবল পুরুষের কান্না ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো রাজসভায়, আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি, আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি।

বিচার শেষ হয়ে গেল। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন কলাম্বাসকে সমস্ত পূর্ব সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য রাজা এই প্রতিশ্রুতি পরে সম্পূর্ণ রক্ষা করেন নি। রানী ইসাবেলার মৃত্যুর পর কলাম্বাস উপেক্ষিত অনাদৃত হয়ে দারিদ্র্যে জীবন কাটিয়েছেন। তবে, শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে। বিচারের সময় স্পেনের সাধারণ মানুষ উচ্চকণ্ঠে কলাম্বাসের মুক্তি দাবি করেছিল। যে-দেশ কলাম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন সেই দেশ থেকেই তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বন্দী করে আনা লোকের সহ্য হয়নি।

বৃদ্ধ বয়সে আবার একবার কলাম্বাস অভিযানে বেরিয়েছিলেন। সেইটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপদজনক অভিযান। জাহাজ ভেঙে তিনি সমুদ্র উপকূলে দলবল নিয়ে আটকেছিলেন এক বছরেরও বেশী। অনুচরদের মধ্যে ভাঙন ধরে। হিংস্র আদিবাসীদের হাতে বন্দী হয়ে সেবার তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল। কিন্তু বিপদের মধ্যেই তাঁর বুদ্ধি খুলতো। সেবার তিনি যে-কায়দায় বেঁচেছিলেন—তা অনেকেরই জানা। তখন ছিল পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের কাল। কলাম্বাস সর্দারকে বলেছিলেন, তাঁকে যদি মুক্তি না দেওয়া হয় তবে ঈশ্বরের কোপে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রমাণ হিসেবে তারা দেখতে পাবে যে আজ রাত্রেই ভগবান চাঁদকে খেয়ে ফেলছেন। সত্যিই চন্দ্রগ্রহণ দেখে তারা সসম্ভ্রমে কলাম্বাসকে মুক্তি দেয়।

ইতিহাসের বিচারে কলাম্বাস সম্পূর্ণ নির্দোষ নন। উপনিবেশ-বাদের যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন তার কুফল পৃথিবীর বহু দেশ বহু শতাব্দী ধরে ভোগ করেছে। কলাম্বাস ক্রীতদাস প্রথার সমর্থন করেছিলেন। ক্রীতদাসদের প্রতি স্প্যানিশদের বর্বর ব্যবহার আজও কুখ্যাত হয়ে আছে। তাছাড়া নতুন খুঁজে পাওয়া দেশগুলিতে খনিজ সম্পদ ছিল প্রচুর। সোনার খনি উদ্ধারের মারাত্মক লোভে কলাম্বাস যতটা নয়, তাঁর পরবর্তী সশস্ত্র ইওরোপীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ভয়ংকরতম অত্যাচার করেছিল।

কিন্তু আবিষ্কারক হিসেবে কলাম্বাস সত্যিই চিরস্মরণীয়। একজন মানুষ অজানাকে জানতে চেয়েছিল—এই রোমান্টিক স্মৃতি কলাম্বাসের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গল্প আছে যে একবার এক সভায় কলাম্বাসের আবিষ্কারের

কৃতিত্ব নিয়ে নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছিল। কেউ কেউ বলেছিল, ও আর কি এমন, জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে একটা কোথাও নেমে পড়া। কলাম্বাস একটা হাঁসের ডিম দেখিয়ে সকলকে বলেছিলেন, এই হাঁসের ডিমটাকে যে কোন উপায়ে কেউ টেবিলের উপর লম্বাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন ? অনেক চেষ্টা করেও কেউ পারলো না। ওরকমভাবে দাঁড় করানো যায় না। তখন কলাম্বাস একটু ঠুকে ডিমের মাথাটা সামান্য ভেঙে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এ কাজটা খুবই সামান্য। কিন্তু এখানে এত লোকের মধ্যে আমিই প্রথম উপায়টা দেখালুম।

মৃত্যুর পরও কলাম্বাস কম ভ্রমণ করেন নি। কলাম্বাসের মৃত্যু হয়েছিল ভ্যালাডোলিড শহরে। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে সমাধি দেওয়া হল সান ডোমিঙ্গোতে। দুশো নব্বই বছর পর সানডোমিঙ্গো ফরাসী অধিকারে যাবার পর সেখানে আর এই স্পেন দেশের গৌরবের মানুষটিকে রাখা যায় না মনে করে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় কলাম্বাস-আবিষ্কৃত কিউবার হাভানা শহরে। সেখানে এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হল। কিন্তু কলাম্বাস বেশী দিন এক জায়গায় চুপচাপ শুয়ে থাকবার মানুষ নন। আবার একশো বছর পর আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বাধবার পর শবাধার তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল স্পেনে। সেখানেই কলাম্বাস এখনো পর্যন্ত শান্তভাবে শুয়ে আছেন।

দুঃসাহসী ব্রুনো

মহাপণ্ডিত কোপারনিকাস যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর হাতে একখানি বই এনে দেওয়া হল। বইখানি কোপারনিকাসেরই লেখা, সেদিনই প্রথম মুদ্রিত হয়ে বেরুলো। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁর শেষ দীর্ঘশ্বাসে কোনো দুঃখের সুর ছিল না।

কোপারনিকাসের মৃত্যু হল, কিন্তু কোনো গ্রন্থের কখনও মৃত্যু হয় না। সেই গ্রন্থের মধ্যে এক মহাবিপ্লবের বীজ লুকানো রইল। সূর্য নয়, এই পৃথিবীই নিতান্ত অনুগত এবং বাধ্য হয়ে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে—কোপারনিকাসের এই বিশ্বাস তিনি নিজের জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে বিশেষ সাহস পাননি, শেষ জীবনে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করলেন—কিন্তু তাও এমন ভাষায় যা শুধু বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। খ্রীষ্টান ধর্মমত এবং বাইবেলের সম্পূর্ণ বিপরীত এই আবিষ্কার, ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত করল ধর্মযাজকদের ক্রোধ, শুরু হলো এই মতের পরিপোষকদের প্রতি নির্যাতন, নির্বাসন এবং হত্যা। পৃথিবীর গতিবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য প্রথম অকুতোভয় শহীদ জিওর্দানো ব্রুনো। মাত্র সাড়ে তিনশো বছর আগে ছিল এমন কুসংস্কার।

ইটালির নোলা শহরে জন্ম, শৈশবেই অনাথ এই বালক প্রতিপালিত হয়েছিলেন খ্রীষ্টান মঠে ধর্মযাজকদেরই দয়ায়। অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতি এই বালক অনায়াসেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তখন ইওরোপে সমস্ত রকম বিদ্যাশিক্ষাই ছিল ধর্মভিত্তিক। ব্রুনো পুরোহিতদের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর মন ছিল চিরকৌতূহলী, অক্লান্ত প্রশ্নসঙ্কুল। বিষম পাঠস্পৃহা ছিল তাঁর, যে বই পেতেন পড়তেন নিপুণ ভাবে এবং যা কিছু পড়তেন বা শুনতেন—তার সব কিছুই নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর গুরুদের শিক্ষা এইজন্য তাঁর কাছে সব সময় নির্ভুল মনে হতো না। আরো অনেক কিছু মানুষের এখনো জানতে বাকী আছে, এই ধারণা দৃঢ় ছিল ব্রুনোর মনে।

একদিন লাইব্রেরীর এক বিস্মৃত শেলফে, ধূলি-ধূসর, বহুদিন অব্যবহৃত একটি চামড়ার বাঁধানো বই তাঁর নজরে এল। এ সেই কোপারনিকাসের মহাগ্রন্থ। কোপারনিকাসের মতবাদ ব্রুনো একটু একটু শুনেছিলেন একবার, এবার তিনি লুকিয়ে, নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে এক কোণে বসে বইখানি

পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর দৃষ্টি বদলে গেল। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, পৃথিবী স্থির নিশ্চল হয়ে আছে আর সূর্য চন্দ্র তারা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। খালি চোখে আকাশে তাকালে তাই-ই মনে হয়। চন্দ্র, সূর্য ও প্রত্যেকটি গ্রহ এক একটা স্ফটিক গোলকের ওপরে বসানো, দেবদূতেরা সেই গোলকগুলো ঘোরায়। এই বিশ্বাস হাজার বছরেরও বেশী পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের কুসংস্কারের অন্ধকারে রেখেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমীও ছিলেন এই ধারণার পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবীই আকাশের অধিপতি—আর সবকিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

কোপারনিকাসের কৃতিত্ব এই, তিনি বললেন, পৃথিবীটাই নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। আমরা বুঝতে পারি না, মনে হয় বুঝি অন্যরাই ঘুরছে। ভার্জিল ইনিড কাব্যে যেমন লিখেছিলেন যে জাহাজ বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে চলতে শুরু করলেও মনে হয় জাহাজটা স্থির, দেশ নগরীই যেন পিছনে সরে সরে যাচ্ছে। কোপারনিকাসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, পৃথিবী নয়, সূর্যই হলো কেন্দ্র, সূর্যকে কেন্দ্র করেই মহাকাশের গ্রহ তারকারা ঘুরছে। কোপারনিকাসের এই ধারণার জন্য অ্যারিস্টার্কাসের কাছে কিছুটা ঋণী ছিলেন।

কোপারনিকাসের এই মতবাদ প্রচার করা যে কতখানি বিপদজনক ছিল তা এখন অনুমান করাও কষ্টকর। কিন্তু মার্টিন লুথারের মতো সংস্কারবাদীও বলেছিলেন, পুণ্যগ্রন্থে এই কথাই লেখা আছে যে যীশুখ্রীষ্ট সূর্যকেই স্থির হতে বললেন, পৃথিবীকে নয়। কোপারনিকাসের বইটি ছাপার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ওসিয়াণ্ডার। তিনি বইটি কিছু অদল বদল করে ছাপলেন। কোপারনিকাসের ভূমিকাটা বাদ দিয়ে নিজেই একটা ভূমিকা জুড়ে দিয়ে লিখলেন, কোপারনিকাসের মত দৃঢ় সত্য বলা যায় না। অঙ্কের হিসাবেও অনুমান নির্ভর। সত্য না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং পরবর্তীকালে কোপারনিকাসের মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হলে তাঁর এতখানি খ্যাতি ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেতো না। কোপারনিকাসের এ তথ্য মোটেই অনুমান ছিল না, ছিল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু তিনি চার্চের গোঁড়ামির কথা জানতেন। তাই অবস্থা সহজ করার জন্যই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন পোপকেই। উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা প্রমাণ করার জন্যই বইটি লেখা। কোপারনিকাস নিজেও ছিলেন খ্যাতিমান পাদ্রী। সুতরাং প্রথম দিকে বইটি নিয়ে খুব উত্তেজনা হয়নি। আস্তে আস্তে

গোঁড়াদের বিরুদ্ধমত তৈরী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত বইখানা চার্চ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। ধুলির আস্তরণ থেকে সেই বইকে উদ্ধার করলেন জিওর্দানো ব্রুনো। তিনি উপস্থিত করলেন আরও অভ্রান্ত নতুন তথ্য। কোপারনিকাস ছিলেন ধীর, স্থির, বিনয়ী। আর ব্রুনো বেপরোয়া, দুর্দান্ত, অকুতোভয়। পড়া শেষ করে ব্রুনো বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকালেন, এখন আকাশের চেহারা তাঁর কাছে অন্যরকম, চন্দ্র সূর্য তাঁর কাছে অন্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এই নতুন জ্ঞান এবং উদ্ভাসনের আনন্দে ব্রুনো ছটফট করতে লাগলেন। মঠের অন্যান্য সাধুদের তিনি ডেকে ডেকে এ কথা বলতে লাগলেন। তাঁর এই অদ্ভুত, অবান্তর, হঠকারী কথা শুনে বিষম চমকে গেল পুরোহিতরা। সর্বনাশ, এসব কি কথা বলছ তুমি? কেউ কেউ বললো, তুমি কি শাস্ত্র পড়োনি? আরে, আরে, তুই কি শেষটায় হীদেন হয়ে গেলি?

ব্রুনো বললেন, হ্যাঁ, আমি সব পড়েছি। কিন্তু মানুষের এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে।

চুপ, চুপ, একথা প্রভুরা শুনতে পেলে তোমার মুস্কিল হবে।

কিন্তু এসব সাবধান বাণীতে ব্রুনোর উৎসাহ নিবৃত্ত হলো না। ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে সেটাকেই অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেবার লোক ছিলেন না তিনি। বিশ্বাস এবং যুক্তি আলাদা জিনিস তিনি জানতেন। ধর্মগ্রন্থে আছে মদ থেকে যীশুর রক্ত ও রুটি থেকে যীশুর মাংস হয়েছিল—যত সব গাঁজাখুরি কথা, এ সম্পর্কে ব্রুনো বলেছিলেন। 'অনেক পরীক্ষা করে সত্যকে খুঁজে বার করতে হয়', লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির এ কথা ব্রুনো মানতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ধৃষ্টতার কথা পৌঁছে গেল ধর্মধ্বজদের কানে। ব্রুনোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা হতে লাগল। চোখের সামনে বিপদ দেখে ব্রুনো মঠ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। শুধু মঠ ছেড়ে নয়, দেশ ছেড়ে। সাধুর পোশাক হল তাঁর ছদ্মবেশের উপায়।

ইটালি থেকে সুইজারল্যাণ্ড যাবার রাস্তা ছিল তখন বড় ভয়ঙ্কর। আল্পসের বিপদজনক গিরিপথে তখন যাত্রিদল দল বেঁধে প্রাণ সংশয় করে পার হতেন। এই রকম একদলের মধ্যে ব্রুনো ছদ্মবেশে, কোন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বা ভাব না করে, পুলিস এবং সাধু দেখলে মুখ লুকিয়ে কোনক্রমে ইটালি পার হয়ে গেলেন।

স্বদেশ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পলায়ন করে যুবক ব্রুনো প্রবল বিশ্বাস এবং দুঃসাহসের সঙ্গে কোপারনিকাসের মত প্রচার করতে লাগলেন। শুধু সেইটুকুই

নয়, সেই সঙ্গে তিনি নিজে এমন কথা বলতে লাগলেন—যা তখনকার দিনের পক্ষে অবিশ্বাস্য মনে হয়। দূরবীন আবিষ্কৃত হয়নি তখনো, খালি চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি এমন সব ধারণার কথা ব্যক্ত করলেন যা পরবর্তী যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোপারনিকাসের চেয়েও ব্রুনোর চিন্তাশক্তি এবং অভিমত অনেক বিশাল এবং নির্ভুল।

—প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। তখন পৃথিবীর কোনো রূপ ছিল না। তারপর তিনি আলোক এবং অন্ধকার বিভাগ করলেন।

সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন। এবং উপরের জল এবং নিচের জল তিনি পৃথক করলেন। উপরের জল হল স্বর্গের জল যা বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে।

সৃষ্টির তৃতীয় দিনে তিনি মাটি এবং জলবিভাগ করলেন এবং উদ্ভিদ, শস্য, তৃণ প্রভৃতির আবির্ভাবের হুকুম দিলেন।

চতুর্থ দিনে তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করলেন পৃথিবীকে আলো দেবার জন্য।

পঞ্চম দিনে সৃষ্ট হল সরীসৃপ, জলজ প্রাণী এবং পক্ষীকুল।

ষষ্ঠ দিন জীবজন্তু এবং মানুষ।

সংক্ষেপে এই হল বাইবেল মতে সৃষ্টিবর্ণনা। এতে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীই হল মহাকাশের কেন্দ্র। সূর্য চন্দ্রের প্রয়োজন শুধু পৃথিবীর জন্যই। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে অদ্ভুত কবিত্ব এবং দর্শন আছে—বিজ্ঞান অন্য কথা বললে, বাস্তব সত্য অন্যরকম হলে ক্ষতি কি ? কিন্তু গোঁড়া পাদরিরা কিছুতেই অন্য ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পর আর কোন বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। পরম কারুণিক ভগবান যীশু যেমন সত্যের জন্য অবিচলিত ভাবে প্রাণ দিয়েছেন—তখনকার মূর্খ, নীতিহীন যীশুভক্ত পাদরিরা ঠিক সেইরকম ভাবেই সত্য ভক্তদের পুড়িয়ে বা বন্দী করে মেরেছে।

ব্রুনো সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই নতুন ব্যাখ্যা দিলেন : কতকগুলি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—তাদের মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে। এই নিয়ে সৌর জগৎ। দূরের নক্ষত্রগুলিও এক একটি সূর্যের মত—তাদেরও কেন্দ্র করে গ্রহ এবং গ্রহমণ্ডলী আছে।

শুধু যে পৃথিবী ঘুরছে তাই নয়, সূর্যও তার মেরুতে ভর দিয়ে ঘুরছে। বিশ্ব অসীম। তাই তার কেন্দ্রে বা প্রান্তে কেউ আছে এ কথা বলাই অর্থহীন।

এই কথাগুলি যে কত সত্যি তা স্কুলের বালকরাও এখন জানে। কিন্তু সে

সময় ব্রুনো এ-কথাগুলি উচ্চারণ করে পদার্থ, জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক বিদ্যায় যে গুরুতর বদল এনে দিলেন আজ তা কল্পনা করাও দুরূহ।

ব্রুনো আর একটি মারাত্মক কথা বলেছিলেন—যে-কথা বাইবেলের চরম বিরোধী। তিনি বললেন, এই যে মহাশূন্যের সব গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র এর সবগুলিরই আরম্ভ এবং শেষ আছে—এবং এরা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা—খ্রীষ্টীয় ধর্মমত শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই বিশ্ব ধ্বংসহীন এবং ঈশ্বর যে ভাবে একে সৃষ্টি করেছেন চিরকাল সেই ভাবেই থাকবে। তাছাড়া ধর্মে আছে স্বর্গ নরকের কথা। নক্ষত্রমণ্ডলীর ওপারে স্বর্গ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে নরক। মানুষের মনের মধ্যে স্বর্গ নরক থাকলেও ব্রুনো যে অসীম বিশ্বের কথা বললেন সেখানে স্বর্গ নরকের কোন স্থান নেই।

ব্রুনো হয়ে উঠলেন ধর্মযাজকদের মহাশত্রু। এই ধৃষ্ট যুবকটি যাতে ঐ সব পাগলামির কথা ছড়াতে না পারে তার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রুনোর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাঁরা প্রস্তুত করলেন—তার মধ্যে একশো ত্রিশটি কারণ। এক এক দেশে ব্রুনোর বসবাস নিষিদ্ধ করতে লাগলেন তাঁরা। ফলে ব্রুনো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং তার ফল হল এই যে, এক দেশে আবদ্ধ না থেকে সারা ইওরোপেই ব্রুনোর মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কৌতূহলী জনতা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল তাঁর কথা। ফলে এখন একমাত্র উপায়, জোর করে এই লোকটির মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া।

মহাশূন্যের অসীম রহস্য নিয়ে ব্রুনো যতই মগ্ন থাকুন, এই সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের স্বভাব নিয়ে যতই বিচার বিশ্লেষণ করুন, এমন কি এই পৃথিবীর কথা নিয়েও যতই ব্যস্ত থাকুন—নিজের জন্মভূমির সামান্য ভূখণ্ডের জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল থাকে। ব্রুনোর মন ছটফট করত অতি প্রিয় ইতালি দেশ দেখবার জন্য। দীর্ঘদিন তিনি সে দেশ থেকে নির্বাসিত। রৌদ্রকরোজ্জ্বল ইতালি, মাতৃভূমির সুবাতাসের জন্য তাঁর মনে অদ্ভুত বিষাদ। ব্রুনোর এই দুর্বলতাই তাঁর শত্রুপক্ষীয়রা কাজে লাগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একজন বিশ্বাসঘাতক ব্রুনোকে ধরিয়ে দিল। গীর্জার অধ্যক্ষদের কাছে ব্রুনো হয়ে উঠেছিলেন এক মারাত্মক শিরঃপীড়া। এই প্রগল্ভ ছোকরার মুখ কোনক্রমে বন্ধ করতে না পারলে যেন তাদের রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। যেন এর কথাবার্তা শুনেই মানুষের সব ভক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর কেউ ধর্ম মানবে না। পুরোহিতদের মুখের কথাকেই বিধান বলে গ্রাহ্য করবে না।

আততায়ী যাজকদের হাতে ব্রুনো ধরা পড়লেন এক নিপুণ ষড়যন্ত্রের ফলে। ইতালির গণ্যমান্য সমাজের এক তরুণ অভিজাত, গিয়োভান্নি মোসেনিগো নাম, সে তাঁর ভক্ত হবার ভান করে তাঁকে চিঠি লিখে জানাল যে সে ব্রুনোর শিষ্য হতে চায় এবং ভক্তিভরে সেই জ্ঞানতপস্বীর কাছে তাঁর জ্ঞানের অংশ নিতে চায়। এজন্য অবশ্য সে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সম্মত আছে। ব্রুনোর পক্ষে এখন দেশে ফিরে যাওয়া খুবই বিপদজনক, কিন্তু সেই ভক্তিমান শিষ্যটি অঙ্গীকার করল যে ব্রুনোকে সে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। সরল, উদাসীন এবং কবিত্বময়-স্বভাব ব্রুনো তাকে বিশ্বাস করলেন—বিদেশে ঘুরে ঘুরে আজ তিনি ক্লান্ত, দেশে ফেরার এই সুযোগ নষ্ট হতে দিলেন না।

ব্রুনো গোপনে চলে এলেন ভেনিসে। সেখানে মোসেনিগোকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর ছাত্র তাঁকে দিয়ে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যদি ব্রুনো ইতালি থেকে চলে যেতে চান তবে প্রথম বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হবে তাঁর ছাত্রকেই।

আসলে মোসেনিগো ইতালির ইনকুইজিসান নিয়োজিত গুপ্তচর—যারা ব্রুনোকে শাস্তি দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্কতা এবং গোপনতার সঙ্গে তাঁরা ব্রুনোকে বন্দী করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন—যাতে তিনি আবার হঠাৎ না পালিয়ে যান—যেমন একবার পালিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে।

কয়েক মাস পরেই মোসেনিগো ব্রুনোকে জানাল যে তার গুরু মোটেই তাকে মন দিয়ে শেখাচ্ছেন না এবং নিজের অনেক বিদ্যা তার কাছে গোপন করছেন। এ-ধরনের শিষ্যকে বরদাস্ত করা ব্রুনোর স্বভাব নয়—তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুগিরিতে ইস্তফা দিয়ে ভেনিস ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হলেন। মোসেনিগো ছুটে গিয়ে খবর দিলেন ধর্মীয় বিচারকদের কাছে। ব্রুনোকে বন্দী করা হল। পনেরোশো বিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে সেদিন।

বন্দী অবস্থায় ব্রুনোকে রাখা হল আট বছর। এই দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য এই যে—তখনই তাঁকে হত্যা করা হলে—শুধু ব্রুনোকেই হত্যা করা হবে—কিন্তু বেঁচে থাকবে তাঁর মতবাদ। কিন্তু অসহ্য অত্যাচারে নতি স্বীকার করে যদি তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জনসমক্ষে তাঁর মতবাদকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন, তাহলেই ধর্মযাজকদের অনেক লাভ।

ব্রুনোকে রাখা হল এমন একটি ঘরে যে ঘরের ছাদ সীসে দিয়ে তৈরী। গরম কালে অসহ উত্তাপে সে ঘর অগ্নিকুণ্ড এবং শীতকালে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায়

লাসকাটা ঘরের মত। একটু একটু করে ব্রুনো মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হলেন—কিন্তু তাঁর মতবাদের দৃঢ়তা একটুও কমল না। স্পষ্টকণ্ঠে তিনি তাঁর উক্তিগুলি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত রইলেন।

আট বছর পরে, বিচারে ব্রুনোর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। বিচারকদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি কি বলেছিলেন—তা এখন আর সব জানবার উপায় নেই। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেছিলেন—যা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "শাস্তির কথা শুনে আমি যতখানি ভয় পেয়েছি, তার চেয়েও অনেক বেশী ভয় পেয়েছো তোমরা—করুণাময় ঈশ্বরের নাম করে আমার প্রতি যখন বিচারের বাণী উচ্চারণ করেছো।"—

আসলে নিজেদের সম্মানের আসন টলে যাবার ভয়েই পুরোহিতরা ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এবং শাস্তির ভাষা ছিল এই রকম, 'পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির এক বিন্দু রক্তও নষ্ট না করে দণ্ড দেওয়া হবে।' অর্থাৎ শিরশ্ছেদ বা ফাঁসী নয়—আগুনে পুড়িয়ে পবিত্রভাবে হত্যা।

মহা আড়ম্বর সহকারে ব্রুনোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মৃত্যুমঞ্চে। রক্ত রঙের পতাকাবাহী একদল লোক চলেছে সামনে। সমস্ত মঠের ঘন্টাগুলি বেজে উঠল। শত শত পুরোহিত পরিপূর্ণ পোশাকে কবরের গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে চলেছেন। ব্রুনোর শরীরে একটি হলুদ রঙের পোশাক—এবং তার উপরে কালো রঙের শয়তানের কুৎসিত মূর্তি আঁকা। মাথায় একটা লম্বাটে ধরণের টুপী—সেটাতে একটা লোক আগুনে পুড়ে মরছে এই ছবি আঁকা। চলার সময় ব্রুনোর হাতের এবং পায়ের শিকলগুলিতে শব্দ হচ্ছে ঝনঝন করে। অনেকটা যীশুর অন্তিম যাত্রার কথা মনে পড়ে। হত্যাকারীদের এই ভয় ছিল যে, মৃত্যুর আগে ব্রুনো যেন উপস্থিত জনসাধারণকে শেষ বারের মত তাঁর আদর্শ এবং বিশ্বাসের কথা বলে যেতে না পারে। সুতরাং ব্রুনোর জিভ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দু পাশের বাড়িগুলির ছাদে, অলিন্দে, প্রাচীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিনা খরচে এমন দৃশ্য খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক দূর দূর থেকেও এই দেখতে এসেছে—কারণ এমন পাপীর শাস্তির দৃশ্য দেখলে পুণ্য হবে।

মৃত্যুর ঠিক আগে ব্রুনোকে সুযোগ দেওয়া হল যে, এখনো সে তার সমস্ত উক্তি এবং বিশ্বাস প্রত্যাহার করে দয়া ভিক্ষা করতে পারে। অসীম ঘৃণাভরে ব্রুনো সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এবং কারুর সাহায্য ছাড়াই সোজা

উঠে গেলেন মঞ্চের উপরে। দণ্ডের সঙ্গে তাঁকে বাঁধা হল, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল পায়ের দিক থেকে।

দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন, কিছুক্ষণ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব দিক। একটু পর প্রতীক্ষমান, উৎসব-লোভী বিপুল জনতা মহা বিস্ময়ে চেয়ে দেখল, ব্রুনোর সর্বাঙ্গ, মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে উঠেছে—কিন্তু সামান্য একটু যন্ত্রণা বা আর্তির চিহ্ন নেই তাঁর মুখে।

ব্রুনোর জন্ম হয়েছিল ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে—এবং মৃত্যু ঠিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। যখন ব্রুনোর মৃত্যু হয় তখন গ্যালিলিওর বয়স ছত্রিশ। গ্যালিলিও তখন প্রবলভাবে পৃথিবীর গতি এবং সূর্য সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

ব্রুনোর মর্মান্তিক পরিণতি দেখে গ্যালিলিও, ডেকার্ত প্রভৃতি মনস্বীরা তাঁদের মতবাদ শেষ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতে ভরসা পাননি।

রোমের যে বাগানে ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

ব্রুনোর জীবনের কথা খুবই অল্প জানা যায়। তাঁর জীবনের অন্যান্য দিক প্রেম-ভালবাসা বা দুঃখের কথা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আধুনিক কালে ব্রুনো বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন। কারণ, বিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য প্রচার করতে গিয়ে তিনিই প্রথম নির্মম ভাবে নিহত হয়েছিলেন। জেমস জয়েস তাঁর ফিনেগান্‌স্ ওয়েক উপন্যাসে ব্রুনোর চরিত্র প্রতিফলিত করেছেন।

গ্যালিলিও

মাথার উপর সব সময় কঠিন নীল আকাশ। সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে নীল দেওয়াল। সভ্যতার শৈশব থেকে মানুষ এই আকাশকে দেখছে, এর অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করবে? প্রতিদিন ভোরে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়,—যে-মানুষের অবশ্য আকাশের দিকে তাকাবার মন আছে—সূর্য উঠছে পূর্বগগনে, সারাদিন ভ্রমণ করে সন্ধ্যেবেলায় চলে যাচ্ছে পশ্চিমের রহস্যময় অস্তকোণে; পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার উপরে মানুষ অবিচলিত, আর উপরে মহাকাশে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুরে ঘুরে মরছে। সাদা চোখে দেখা এই বাস্তব জিনিসেই মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মহাপণ্ডিত টলেমী, অ্যারিস্ততল্‌ও এই কথা প্রচার করেছেন। তার চেয়ে বড় কথা, পুণ্যগ্রন্থ বাইবেলে এ কথা লেখা আছে। বাইবেলের সত্য, জীবনের মত অভ্রান্ত।

প্রত্যেক যুগেই দু-একজন পাগলাটে ধরনের লোক থাকে—যারা সকলের মতের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না, তারা প্রত্যেক জিনিসের কারণ জানতে চায়, যুক্তি ছাড়া কিছু মানতে চায় না। এক জিনিসের স্বভাবের সঙ্গে অন্য জিনিস মিলিয়ে দেখে। এই বিপদজনক অনুসন্ধিৎসার মূল্যও দিতে হয়েছে অনেককে। ব্রুনোর অপমৃত্যুও দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিকদের নিরস্ত করেনি। পৃথিবী এবং সূর্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে পারেননি আরেকজন, সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয় বিজ্ঞান-দার্শনিক গ্যালিলিও। তার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে অশক্ত শরীরে ধর্মীয় বিচারকদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—যে বিচারের ফলে তিনি পেয়েছিলেন আজীবন বন্দীত্ব এবং যে বিচার তাঁর সমস্ত মনের জোর ভেঙে দিয়েছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ এবং দার্শনিক—এই তিন পরিচয়েই অত্যন্ত গৌরবময় ছিলেন গ্যালিলিও। তাঁর অনেকগুলি আবিষ্কার পরবর্তী যুগকে প্রভূত সাহায্য করেছে, অনেকগুলি আবিষ্কার ভুল প্রমাণিত হয়েছে, নিজের বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রাখতে পারেননি ঠিকই—কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ খাঁটি কৌতূহল, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা এবং বিজ্ঞানের সত্যকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা চিরকালের সংবর্ধনা পাবার যোগ্য। গ্যালিলিওকে বলা হয় আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

গ্যালিলিওর জীবনের বহু উত্থান পতন বিচিত্র। তাঁর প্রথম জীবনের উদ্যম এবং শেষ জীবনের অনীহা অত্যন্ত কৌতুহলময়। অনেক বিবরণ হারিয়ে গেছে, অনেক ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের বিভিন্ন মত। বিচারের সময় তাঁর বিচিত্র ব্যবহার, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব—এক কারণ সম্বন্ধে সঠিক যুক্তি গড়ে তোলা যায় না। হয়তো তাঁর ভঙ্গী ছিল বিদ্রূপের অথবা ভয় অথবা উদাসীনতার। ব্রুনোর ভয়াবহ পরিণতি দেখে তিনি হয়তো দমে গিয়েছিলেন।

গ্যালিলিও জন্মেছিলেন ইটালীর পিসা নগরে ১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। তাঁর বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, কিন্তু ধনী নন। ছেলেবেলায় নানা বিষয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়েছিল এই ছেলেটি। সে নানারকম খেলনা বানাতে পারতো, ছোটখাট যন্ত্র তৈরী করার ঝোঁক ছিল। আবার বাঁশী বাজাতে জানতো, অর্গান বাজিয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। ছবি আঁকাতে তার দক্ষতা এমন ছিল যে, সে শহরের অনেকেই মনে করেছিল যে বড় হয়ে এই ছেলে নিশ্চয়ই কোন বড় শিল্পী হবে। শিল্পীর দেশ ইতালী, গ্যালিলিওর পক্ষে সার্থক শিল্পী হওয়া অসম্ভব ছিল না। পুত্রের এই বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পিতা বিব্রত হয়ে উঠলেন। এই জাতিস্মরতুল্য বালক, ইংরেজীতে যাকে বলে প্রডিজি—একে কি বিষয়ে শিক্ষা দেবেন, এই নিয়ে চিন্তা হয়েছিল তাঁর পরিবারের। শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা ঠিক করলেন, যে পথ নিশ্চিত অর্থকরী, সে পথেই পুত্রকে নিয়োজিত করবেন। ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন ডাক্তারী পড়ার জন্য।

পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তেন গ্যালিলিও, সঙ্গে সঙ্গে অ্যারিস্ততলের দর্শন। খুব যে একটা মনোযোগী ছাত্র ছিলেন তা নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি একটি বিখ্যাত আবিষ্কার করলেন। পিসার ক্যাথিড্রালে একটি ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন ছিল। অত্যন্ত সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠন, হাওয়ায় অল্প অল্প দুলতো। লণ্ঠনের দুলুনি দেখে মুগ্ধ হতেন হয়তো অনেক শিল্পী এবং কবি। ছাত্র গ্যালিলিও মুগ্ধ হয়ে দেখতেন মাঝে মাঝে। ক্রমশ লণ্ঠনের দোলানি তাঁকে অন্য কারণে আকর্ষণ করলো। অনেক সময় গ্যালিলিওকে দেখা যেতে লাগলো সেই ঝাড়লণ্ঠনের দোলার সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে, ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধ টিপে, ডাক্তারেরা যে ভাবে নাড়ী দেখেন। ক্রমে গ্যালিলিও দেখলেন লণ্ঠনের দোলানির একটা গতি আছে। এর থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত আইসোক্রোনাস

পেণ্ডুলাম। ডাক্তারদের পাল্স বিট গণনার কাজে এই পেণ্ডুলাম ব্যবহার হতে লাগল। এই ঘটনার পর থেকেই পেণ্ডুলামের সাহায্যে ঘড়ি তৈরী করার কথা ভাবতেন গ্যালিলিও। কিন্তু নানা কাজে তা হয়ে ওঠেনি। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর বাদে, গ্যালিলিওর ছেলে বাবার তৈরি নক্সা দেখে পেণ্ডুলাম দেওয়া ঘড়ি তৈরী করেন।

কিন্তু ডাক্তারী ডিগ্রী গ্যালিলিওর নেওয়া হল না। মধ্যপথে অর্থাভাবে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল। জীবিকার জন্য কিছুদিন পিসা ত্যাগ করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময় তাঁর ঝোঁক গেল অঙ্ক বিদ্যার দিকে। অত্যন্ত মনঃসংযোগ করে অল্পকালের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন এবং পঁচিশ বছর বয়সে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপক হিসাবে প্রভূত সুনাম হল তাঁর, দেশ বিদেশের ছাত্ররা আকৃষ্ট হত তাঁর প্রতি। এই সময় আবিষ্কার করলেন তাঁর অতি বিখ্যাত 'ল অব ফলিং বডিস্'। যে কোন লঘু বা গুরু ওজনের পদার্থ উপর থেকে মাটিতে ফেললে এক সময়ে নীচে পড়বে। কথাটা শুনতে অদ্ভুত। অ্যারিস্ততল্ বলেছিলেন, একটা দশ পাউণ্ড ওজনের জিনিস আর একটা এক পাউণ্ড ওজনের জিনিস উপর থেকে ফেললে, এক পাউণ্ডের জিনিসটার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় লাগবে দশ পাউণ্ড জিনিসের। এ কথা যে মিথ্যে গ্যালিলিও তা প্রমাণ করে দেখাতে চাইলেন। গণ্যমান্য লোক, ছাত্র, অধ্যাপক প্রভৃতির এক বিরাট দল নিয়ে তিনি হাজির হলেন পিসার বিখ্যাত টাওয়ারের সামনে। এক পাউণ্ড আর দশ পাউণ্ড ওজনেরই দুটো জিনিস ফেললেন ওপর থেকে। দুটো একই সময়ে নীচে পড়লো। অ্যারিস্ততলের মত মিথ্যে হয়ে গেল।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ক্ল্যাসিক্সের পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল। অ্যারিস্ততলের মতবাদ অত্যন্ত বন্দিত এবং জনপ্রিয় ছিল ইতালীতে। সুতরাং, সেই মনীষীর প্রতি একজন যুবকের এই অবহেলায়, প্রগল্ভ ধৃষ্টতায়, রক্ষণশীল প্রবীণ দল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যও তাঁরা মানতে চাইলেন না। গ্যালিলিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন।

কিন্তু তখন তিনি জনপ্রিয়। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার গণিতের অধ্যাপকের পদ পেলেন। এখন তিনি নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কারে মাতলেন। প্রথমে সেক্টর কম্পাস। তারপর টেলিস্কোপ। না, টেলিস্কোপ ঠিক গ্যালিলিওর আবিষ্কার নয়, কিন্তু গ্যালিলিও টেলিস্কোপ যন্ত্রটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় যন্ত্রটি সম্পূর্ণ কাজে লাগালেন। নিজের হাতে তিনি

নিজস্ব পদ্ধতির টেলিস্কোপ তৈরী করতে লাগলেন এবং প্রায় ১০০ টেলিস্কোপ তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডে বই ছাপানোর ব্যবসায় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। লোকের বই পড়ারও ঝোঁক আসে। সেই সময় দেখা গেল, অনেক লোকেরই চোখ খারাপ, অনেকেই কাছের জিনিস দেখতে পায় না। তখন সেই চোখের অসুখের চিকিৎসা করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো চশমা। এবং চশমার নানা রকম লেন্স থেকেই দূরবীন। সেই আবিষ্কারের পদ্ধতির কথা শুনেই গ্যালিলিও নিজেও তৈরী করলেন দূরবীন। রোমে এসে তিনি পোপ এবং পুরোহিতসমাজকে মহা উৎসাহে টেলিস্কোপের ব্যবহার দেখাতে লাগলেন (তখন বুঝতে পারেননি—পুরোহিতরা তাঁর এই আকস্মিক উৎসাহ সুনজরে দেখছেন না)। টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন যে, চাঁদ কোন একটা চক্‌চকে আয়না সদৃশ পদার্থ নয়, নিতান্তই একটি পর্বতবহুল উপগ্রহ। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, ওটা প্রতিফলিত, রোদ্দুরের লুকোচুরি রূপ হলো জ্যোৎস্না। গ্যালিলিও বললেন, মিল্কিওয়ে অর্থাৎ ছায়াপথ সত্যিই কোন পথ নয়, কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ-নক্ষত্র। জুপিটারের চারিটি গ্রহ আবিষ্কার করলেন, এবং মেডিসি পরিবারের কাছে তিনি অনুগৃহীত ছিলেন বলে তাঁদের নাম অনুসারে গ্রহগুলির নাম রাখলেন। টেলিস্কোপে তিনি শনির বলয় দেখতে পেলেন।

গ্যালিলিওর বহু আগে কোপারনিকাস লিখে গিয়েছেন যে সূর্য স্থির, এবং পৃথিবী তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এবং সূর্যই এই সৌর মণ্ডলের অধিপতি। গ্যালিলিও এই মত সমর্থন করলেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রচার করতে লাগলেন। গ্যালিলিওর এই কাজের ফল হল বিষময়। তাঁর বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হতে লাগলো, পাদ্রীরা তৎপর হল। তারা বাইবেলের অংশ উদ্ধৃত করে দেখাতে লাগলো যে, গ্যালিলিওর মত ভুল। সেই সময় জার্মানিতে কেপ্‌লার বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কেপ্‌লারের পাঠানো একটি বই-এর উত্তরে গ্যালিলিও চিঠি লিখলেন, 'বহুদিন আগেই আমি কোপারনিকাসের মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি প্রমাণ তৈরী করেছি, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস পাই না। জগতে মূর্খের সংখ্যা এত বেশী যে অধিকাংশ লোকই শুরু কোপারনিকাসকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। খুব কম লোকেই তাঁর অমর কীর্তিকে অনুধাবন করতে পারে। আমি কিছু লিখলে হয়তো আমাকেও লোকে ঐ রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে।'

১৬১২ সালে গ্যালিলিও একজন পাদ্রীর বিরুদ্ধে এক গরম চিঠি লিখলেন

এই বলে যে, সে বাইবেল ভুল পড়াচ্ছে। ক্যাস্টেলি নামে এক বৈজ্ঞানিককে গ্যালিলিও যে চিঠি লিখেছিলেন, তা অমর সত্য। বলেছিলেন "ধর্মগ্রন্থ ভুল বলে না, কিন্তু যাঁরা তার ব্যাখ্যা করেন তাঁদের বহু ভুল হয়। প্রকৃতি ঈশ্বরের সৃষ্টি করা। প্রকৃতি কখনও আপন নিয়ম ভাঙে না। মানুষ বুঝুক আর না বুঝুক প্রকৃতির খেলা চলতেই থাকে।…আমাদের ইন্দ্রিয় বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যে জিনিস সত্য বলে জানে—ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে তাকে অস্বীকার করা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মানুষের চিন্তাশক্তিকে কে সীমা দিয়ে বাঁধতে পারে? এমন কে আছে যে বলতে পারে, বিশ্ব সম্বন্ধে আমি যা জানি তা ছাড়া আর জানার কিছুই নেই?"

এর ফল হল, সেই পাদ্রী সোজা গিয়ে পোপের কাছে নালিশ করলো। সে-সময় পোপের প্রভুত্ব এবং ক্ষমতার কথা সকলেরই জানা। বন্ধুরা বারবার গ্যালিলিওকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সেই উত্তেজিত আবহাওয়ার সময়ও গ্যালিলিও রোমে এসে সরবে নিজের মত প্রচার করতে লাগলেন। সেই সময় পোপের পক্ষ থেকে নৈতিক শাসক দল বা ইনকুইজিসান নিয়োগ করা ছিল।

১৬১৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিওকে ইনকুইজিসান থেকে ডেকে বলা হল যে, গ্যালিলিও তাঁর মত প্রচার করতে পারবেন না বা এ-সম্পর্কে বই লিখতে পারবেন না—এ আদেশ অমান্য করলে তাঁর জেল হবে। কোপারনিকাসের বই নিষিদ্ধ করা হল। গ্যালিলিও নত মস্তকে এই নির্দেশ মেনে নিলেন। কিন্তু গ্যালিলিওর আসল বিচার হয়েছিল এর সতের বছর পর ১৬৩৩ সালে।

১৬১৬ সালের নির্দেশ গ্যালিলিও মুখে মেনে নিলেও কাজে খুব একটা মানেন নি। তিনি নিজেও ছিলেন ধর্মভীরু, চার্চকে অস্বীকার করার ইচ্ছে তাঁর কখনোই ছিল না। ১৬৩২ সালে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বিশ্বের প্রধান দুটি নিয়ম সম্পর্কে কথোপকথন"। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগে তিনি পোপের অনুমতি চেয়েছিলেন। পোপ অনুমতি দিলেন এই শর্তে যে, এতে লিখতে হবে কোপারনিকাসের মতবাদ অনুমান মাত্র।

গ্যালিলিও বইটি প্রকাশ করলেন। বইটিতে তিনটি চরিত্র। একজন কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাসী, দ্বিতীয়জন কোপারনিকাস বিরোধী, তৃতীয়জন নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় চরিত্রটি একটু বোকা বোকা ধরনের। গ্যালিলিওর ভাষা ছিল সাহিত্যিকের মতো, বইটি সাধারণ লোকেরও বোধগম্য। অনেকে

রটিয়ে দিলে—দ্বিতীয় চরিত্রটি পোপেরই ব্যঙ্গ চিত্র।

দূরবীন আবিষ্কারের ফলে গ্যালিলিও কোপারনিকাস ও ব্রুনোর মতবাদ-গুলিই প্রমাণিত করতে লাগলেন। তবু গোঁড়ারা বলতে লাগলো, অ্যারিস্ত-তলের বইতে যখন এ কথা নেই, তখন গ্যালিলিওর সব কথা মিথ্যে। এ কাচের মধ্যে দিয়ে যা দেখাচ্ছে—তা হয় চোখের ভুল, না হয় কাচের কারসাজি।

এই সময় গ্যালিলিও কেপ্‌লারকে একটা চিঠিতে লিখলেন, "প্রিয় কেপ্‌লার, তুমি এখানে থাকলে খুব ভালো হতো। দুজনে প্রাণের সাধ মিটিয়ে হেসে নিতাম। পাড়ুয়ার দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপককে কতবার বললুম, দূরবীনের মধ্য দিয়ে চাঁদ ও গ্রহদের দেখুন। দেখতেই চান না। তুমি এখানে থাকলে কি মজাই হতো কেপলার! এই মহা মূর্খের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা দুজনে এক সঙ্গে বসে হো-হো করে হাসতুম!" এই গ্রন্থ প্রকাশের পর আবার ধর্মভীরু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হল। নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে অবিলম্বে তাঁকে ডেকে পাঠান হল রোমে।

এখন গ্যালিলিও বৃদ্ধ, বয়স সত্তর। চার্চের আহ্বানে তাঁর মধ্যে এক বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হল। হয় তিনি ভীষণ ভয় পেলেন অথবা দারুণ উদাসীনতা এল তাঁর মধ্যে। হয়তো ব্রুনোর মর্মান্তিক পরিণতির কথা তাঁর মনে পড়লো। পৃথিবীর অন্যান্য মনীষীদের মত অন্যায় অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার মনোবল তিনি পেলেন না। যৌবনের সেই তেজ আর তাঁর নেই।

রোমে তাঁকে তলব করা হল, তিনি আসতে চাইলেন না। বার্ধক্য এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দয়া প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হল না। কার্ডিনাল বারবেরিনি তাঁকে কিছুটা সময় দিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্সের নীতি-শাসক ভয় দেখালেন যে, যদি দেখা যায় যে সত্যিই গ্যালিলিও অসুস্থ নন—তবে তাঁকে শিকলে বেঁধে টেনে আনা হবে। অবশেষে তিনি রোমে এলেন। যদিও পোপের আদেশে তখন তাঁর উপর কোন অত্যাচার করা হয়নি। শাসকদের সামনে তাঁকে জেরা করা হল এইভাবে—

প্রশ্ন। এই 'কথোপকথনের' লেখক গ্যালিলিও এবং আপনি কি এক লোক?

গ্যালিলিও। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। এই গ্রন্থের মতবাদ কি গ্রহণের অযোগ্য হয়? ১৬১৬ সালে

আপনার প্রতি কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আপনার মনে আছে ?

উত্তর। হ্যাঁ। আমাকে পৃথিবী এবং সূর্য সংক্রান্ত নীতির প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন। আপনি তা মেনেছেন ?

উত্তর। হ্যাঁ, ঐ নীতি সমর্থন বা পক্ষ অবলম্বন করা আমার উচিত নয়।

প্রশ্ন। আপনি কি পরেও ঐ নীতি শিক্ষা দেননি ?

উত্তর। ঐ নীতি শিক্ষা দিতে বারণ করা হয়েছিল কিনা আমার মনে নেই।

এই জেরার পর তাঁকে একদিন বন্দী করে রাখা হল। ইতিমধ্যে তিনজন জ্যোতির্বিদ ভালো করে বইটি পরীক্ষা করে দেখলেন।

পরদিন তাঁকে আবার জেরা করা হল।

প্রশ্ন। আপনি বলেছেন আগেকার নির্দেশ আপনি মেনে ছিলেন। তবে আপনার বইতে কি আছে ?

উত্তর। বইটা তিন বছর বাদে আবার পড়ে দেখলাম। জোয়ার ভাঁটা এবং সূর্য কলঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে, তা বোধহয় ভুল।

প্রশ্ন। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে ?

উত্তর। পৃথিবী ঘোরে এ-কথা আমি আর বিশ্বাস করি না। আমাকে সময় দেওয়া হলে আমি এর বিপক্ষে কিছু লিখতে পারি।

বিচারকরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। আবার কিছুদিন বন্দী করে রাখা হল। অবশ্য ঠিক সাধারণ বন্দীর মত জেলখানায় নয়, টাসকানির রাষ্ট্রদূতের গৃহে নজরবন্দী ভাবে।

১৬৩৩-এর ১০ই মে থেকে আবার বিচার হয়। এবারে তাঁর প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিও কেমন যেন নিস্তেজ। একটাও জোরালো প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠে ফুটলো না। আগাগোড়া মাথা নিচু করে রইলেন, সব মেনে নিলেন যেন।

প্রশ্ন। কতদিন ধরে আপনি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী ঘোরে ?

উত্তর। বহুদিন থেকে, ১৬১৬ সালের আগে থেকেই, সূর্য ঘোরে এবং পৃথিবী ঘোরে—এ দুটি মতই বিচারযোগ্য। কিন্তু পুরোহিতরা যখন সমর্থন করেন না, তখন আমি পুরানো মতই মানি। ১৬১৬-র পর থেকে কোপার-নিকাসের মত মানি না।

প্রশ্ন। এ কথা মিথ্যা। আপনি তার পরও মেনেছেন।

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে আপনার বইতে কি আছে পড়ছি। শুনুন।

(সূর্য পৃথিবীর অংশ পড়া হল)

উত্তর। আমি এ-কথা লিখে থাকলেও মনে বিশ্বাস করি না।

বিচারকরা গ্যালিলিওকে ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাব রহস্যময় রয়ে গেল। কোন ভয় বা অত্যাচারে গ্যালিলিও এমনভাবে স্বীকারোক্তি দিলেন তাও জানা যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, ১৬১৬ সালের নির্দেশ লঙ্ঘন, বিনা অনুমতিতে পুস্তক প্রকাশ, ধর্ম বিরোধী মত এবং বাইবেল সম্পর্কে সংশয় প্রচার। শাস্তি দেওয়া হল, তখনকার দিনের পক্ষে লঘু শাস্তিই বলা উচিত, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত হবে, অনির্দিষ্টকাল বন্দী থাকতে হবে, তিন বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে সাতটি করে বাইবেলের শ্লোক উচ্চারণ করতে হবে।

গ্যালিলিও মাথা নিচু করে শাস্তির আদেশ শুনলেন এবং আস্তে আস্তে মাটিতে পা ঠুকে বললেন, "E Pur Si Muove" অর্থাৎ 'তবুও পৃথিবী ঘুরবে।' (অনেক সমালোচক এই শেষ উক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এটা কিংবদন্তি! কারণ গ্যালিলিওর তখনকার অন্যান্য কথা বা মনোভাবের সঙ্গে এ উক্তি মেলে না।)

অবশিষ্ট জীবন গ্যালিলিও বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। এর পর বেঁচে ছিলেন আট বছর—শেষ পাঁচ বছর অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বন্দী অবস্থাতে তাঁকে সামান্য সম্মান দেওয়া হয়েছিল—বিভিন্ন গৃহে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হত।

সিয়েনার এক আর্চ বিশপের বাড়িতে কিছুদিন রাখা হল। সেই আর্চ বিশপ ছিলেন তাঁর বন্ধু। তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে গ্যালিলিওকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। গ্যালিলিও বিশ্বের অমর জ্ঞানীবৃন্দের অন্যতম। সেখান থেকে তখন তাঁকে সরিয়ে আনা হল। নির্দেশ দেওয়া হল যে, এখন থেকে তিনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে কোন কথা বলতে পারবেন না। এ সময় গ্যালিলিওর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙে পড়লো। চিকিৎসার জন্য তিনি ফ্লোরেন্সে আসতে চাইলেন। কিন্তু আসতে দেওয়া হল না। কিছু-দিনের মধ্যে অন্ধ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ফ্লোরেন্সে আসতে দেওয়া হল, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব বা কারুকে দেখা করতে দেওয়া হবে না—এই শর্ত আরোপ করা হল।

১৬৩৮ সালে কবি মিল্টন এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। মিল্টনের কবিতায় গ্যালিলিওর বিশ্বাসের সমর্থন আছে।

১৬৪২ সালের জানুয়ারী মাসে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। সাণ্টাক্রসে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। এবং মৃত্যুর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়া হল এবং কবরের উপরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল।

যে বছর গ্যালিলিওর মৃত্যু, ঠিক সেই বছরেই জন্ম হয় আইজাক নিউটনের। গ্যালিলিওর গতি-তত্ত্বকে পূর্ণ বিকশিত করেন নিউটন এবং নিজের অসাধারণ প্রতিভায় পরবর্তী যুগের জন্য বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ পথ তিনি খুলে দিয়েছিলেন।

ওয়াল্টার র‍্যালের বিচার ও মৃত্যু

রানী এলিজাবেথ এবং আর্ল অব এসেক্সের প্রণয় কাহিনী বিশ্ববিখ্যাত। রানীর চেয়ে তাঁর এই প্রেমিক ছিল তেত্রিশ বছরের ছোট। এসেক্সকে দেখে যখন রানী প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলেন, আকুল হয়েছিলেন, সারারাত এসেক্সের সঙ্গে নির্জন ঘরে জেগে কাটিয়েছেন—তখন এসেক্সের বয়স মাত্র কুড়ি, রানীর তিপ্পান্ন।

নির্জন ঘরে সময় কাটাচ্ছেন রানী এবং এসেক্স, দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছেন একজন দীর্ঘকায়, রূপবান, বলিষ্ঠ, অত্যন্ত সৌখিন বসনে ভূষিত পুরুষ—রানীর প্রাক্তন প্রেমিক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে। সদ্যযুবা, সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ এসেক্স প্রথম দিনই র‍্যালেকে দেখে ঈর্ষায় এবং ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন। এই বিশাল, অহংকারী-মুখ পুরুষটি কেন রানীর এত কাছে থাকবে! এসেক্স ক্রমে ক্রমে রানীর উপর ঐ লোকটির প্রভাব এবং ওর প্রতি রানীর প্রীতির কথা জানতে পারলেন। তাঁর মনে ঘোরতর ঘৃণা এবং শত্রুতাবোধ জেগে উঠল র‍্যালে সম্পর্কে।

মাত্র চোদ্দ বছর এসেক্স রানীর সংসর্গে ছিলেন। মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হয়েছে—কিন্তু এসেক্স একটু কাতর গলায় স্তুতি করলেই রানী আবার তাঁকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছেন। ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিলেন এসেক্স—কিন্তু র‍্যালে সম্বন্ধে তাঁর ক্রোধ কিংবা ভয় কখনো যায়নি। শেষ পর্যন্ত র‍্যালের আতঙ্কেই এসেক্স রানীর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তার ফল অবিলম্বে বন্দীত্ব, বিচার এবং মৃত্যু।

এসেক্সের বধ্যভূমিতে দেহরক্ষীদের অধ্যক্ষ হিসাবে ওয়াল্টার র‍্যালেও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে র‍্যালের উল্লসিত হবার কথা। মৃত্যুর আগে র‍্যালের হাস্যমুখ দেখাই হবে এসেক্সের চূড়ান্ত অপমান। কিন্তু সহজাত ভদ্রতায় র‍্যালে সেখান থেকে চলে গেলেন। দূরে একটা ব্যালকনিতে নির্জনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে লোকে দেখলো র‍্যালে তাঁর পরম শত্রুর মৃত্যুতেও দুহাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কাঁদছেন।

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের জীবন উত্থান পতনে, জনসাধারণের ঘৃণায়-অভিনন্দনে, রানীর ক্রোধ এবং প্রেমে, অভিজাত সমাজের বন্ধুত্ব এবং শত্রুতায় বহু বিচিত্র। তিনি ছিলেন এলিজাবেথান যুগের প্রধান প্রতিনিধি। কি তাঁর পরিচয়! ভয়ঙ্কর জলদস্যু, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অকুতোভয় আবিষ্কারক, প্রতি-

ভাবান কবি, প্রগাঢ় পণ্ডিত, নিপুণ বক্তা, স্বচ্ছ দার্শনিক, তীক্ষ্ণ রাজনীতিবিদ, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ঐতিহাসিক। কেউ কেউ তাঁকে বলেছেন যুগের প্রবক্তা, কেউ কেউ বলেছেন মহান শয়তান। সব মিলিয়ে র‍্যালে একজন প্রবল পুরুষ—রক্তমাংসে এবং কল্পনার সূক্ষ্মতায়। অর্থাৎ রেনেসাঁসের নির্ভুল প্রতীক।

র‍্যালে এমন এক বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যাকে বলা হয় ইংল্যাণ্ডের জঘন্যতম বিচার। তাঁর বিচারকদের মধ্যে একজন বহুদিন পর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের ন্যায়বিচার এর আগে আর কখনো এমন বঞ্চিত এবং আহত হয়নি—র‍্যালের বিচার প্রহসনের মতো। এই বিচার হয়েছিল এলিজাবেথের মৃত্যুর ঠিক পরেই। এলিজাবেথ র‍্যালেকে যেমন প্রগাঢ়ভাবে ভালোবাসতেন—(একবার নৌ-অভিযানের সমস্ত ঠিকঠাক হবার পর রানী র‍্যালেকে বলেছিলেন, 'তুমি নিজে যেও না, তোমাকে ঐ বিপদের মধ্যে পাঠাতে আমার ভরসা হয় না, তা ছাড়া তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারবো না।) আবার বিরূপও হয়েছেন বহুবার। র‍্যালের বিয়ের খবর শুনেই রানী তাঁকে দু মাস জেলে পুরে রেখেছিলেন। (প্রণয়ীরা বিয়ে করলেই রানী বিষম চটে যেতেন।) কিন্তু রানী কখনো তাঁকে চরম শাস্তি দেবার কথা ভাবেননি।

র‍্যালে এলিজাবেথের নজরে প্রথম আসেন যে ঘটনায় তা অনেকেরই জানা। একটু কর্দমাক্ত জায়গা দিয়ে হাঁটবার সময় রানীর পায়ে যাতে কাদা না লাগে সে জন্য র‍্যালে তাঁর কোট খুলে রানীর সামনে পেতে দিয়েছিলেন। এখনো ইংরেজদের ভদ্রতার প্রসঙ্গে এ-গল্প আলোচিত হয়। তারপর থেকে রানী তাঁকে প্রেম বিলিয়েই ক্ষান্ত হননি—সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন বহুতর সম্মান এবং পদমর্যাদা। ক্রমে ক্রমে র‍্যালে হয়েছিলেন রানীর দেহরক্ষীদের অধ্যক্ষ—এই পদ ছিল সে সময় চূড়ান্ত লোভনীয়, কারণ এই পদাধিকারী সব সময় রানীর কাছে কাছে থাকবার সুযোগ পায়। খ্রীষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত হয়নি এমন যে-কোন নবাবিষ্কৃত দেশের স্বত্বাধিকার দিয়েছিলেন তাঁকে রানী। ইংল্যাণ্ড কর্তৃক স্প্যানিশ আর্মাডা দমনে র‍্যালে নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যৌবনে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বাইরে ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কৃতিত্ব র‍্যালের। বৃহত্তর পৃথিবী আবিষ্কারে স্পেন এবং পর্তুগাল যত অগ্রসর হয়েছিল—ইংল্যাণ্ড তা পারেনি। র‍্যালে সেই পথ খুলে দিয়েছিলেন। আমেরিকার উপকূল দখল, ভার্জিনিয়া, গায়না প্রভৃতি অঞ্চল র‍্যালের প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ডের দখলে আসে। এইসব প্রচেষ্টায় অনেকবার

বিফলও হয়েছিলেন র‍্যালে, কিন্তু কখনো উদ্যম ত্যাগ করেননি। জলপথে বহু জাহাজ লুঠ করে লুণ্ঠিত ধনে খুশী করেছেন রানীকে।

অথচ ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ কখনো তাঁর উপর খুশী হয়নি, কারণ তাঁর অহংকার এবং স্পর্ধা। স্পর্ধার যোগ্য লোক ছিলেন তিনি। কখনো কথা-বার্তায় কাউকে গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর ধর্মমত নিয়ে লোকের মনে সংশয় ছিল। অনেকের সংশয় ছিল, বুঝি র‍্যালে একজন নিরীশ্বরবাদী। তিনি ছিলেন একজন, যাকে বলে ফ্রি থিঙ্কার, চিন্তার মুক্তিবাদী—যেটা তখনকার ইওরোপের এক অদ্ভুত জিনিস। ধর্মবিরোধিতার জন্য তখন ইওরোপের বিভিন্ন দেশে চার্চের উদ্যোগে মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়। কবিতার নতুন আঙ্গিক খুঁজতে চেয়েছিলেন র‍্যালে, তেমনি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর নতুন নতুন দেশ, চিন্তার নতুন নতুন জগৎ। কুখ্যাত জলদস্যুদের সঙ্গে তাঁর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। প্রখ্যাত আবিষ্কারকদের ইতিহাসে তাঁর নাম অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি কাব্য সঙ্কলনে তাঁর রচনা বাদ পড়ে না। এডমণ্ড স্পেন্সার র‍্যালেকে বলেছেন, 'সমুদ্রের রাখাল।'

প্রচুর কবিতা লিখেছেন র‍্যালে, কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। অনেক কবিতা শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়নি, অনেক রচনা হারিয়ে গেছে। রানী এলিজাবেথকে নিয়ে তিনি যে কাব্য রচনা করেছিলেন সেটা নিজের জীবদ্দশায় ছাপতে চাননি। এখন মুদ্রিত হয়েছে। শুধু রানীই হবেন তাঁর একমাত্র পাঠিকা এই ছিল র‍্যালের ইচ্ছা। এই কাব্যে রানীর নাম দিয়েছিলেন সিনথিয়া। কি গৌরবোজ্জল সে সময়কার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস! ফিলিপ সিডনী, ফ্রান্সিস বেকন, জন ডান, জর্জ গ্যাসকয়েন, বেন জনসন, ক্রিস্টোফার মার্লো, শেকসপীয়র, এডমণ্ড স্পেন্সার প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীরা বিচরণ করতেন সে সময়ে। মার্লো ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। মার্লোর মৃত্যুকাহিনীর সঙ্গে র‍্যালের নাম ভুলভাবে জড়িত হয়েছিল এক সময়ে। শেকসপীয়ারের 'লাভ্‌স লেবার লস্ট' নাটকের নায়ক যে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে এ-কথা অনেকে মনে করেন।

বহুকাল পর যখন শেকসপীয়ারের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল, যখন আলোচনা হতে লাগলো যে শেকসপীয়ারের নামে প্রচলিত নাটকগুলি সত্যিই শেকসপীয়ারের না অন্য কারুর—তখন র‍্যালের নাম আবার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল। একদল যেমন মনে করেন যে ফ্রান্সিস বেকনই ছদ্মনামে হ্যামলেট, ওথেলো এইসব নাটকগুলি লিখেছেন, তেমনি র‍্যালেকেও অনেকে

ঐ নাটকগুলির রচয়িতা মনে করেন। অন্ততঃ 'টেমপেস্ট' নাটকে যে র‍্যালের খুব ছাপ আছে—এবিষয়ে অনেকেই দৃঢ় নিশ্চিত।

স্পেন্সারের অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন র‍্যালে। স্পেন্সারের 'ফেইরি কুইন' ছাপা হয় র‍্যালের উদ্যোগে। এলিজাবেথের সঙ্গে স্পেন্সারের আলাপ করিয়ে দিয়ে স্পেন্সারের জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। দুজনে ছিলেন দুজনের কবিতার অন্তরঙ্গ সমঝদার। 'কেউ কাউকে ঈর্ষা করেননি বা ঈর্ষিত হননি।' অমন দুর্দান্ত পুরুষ র‍্যালে ছিলেন কবিতা সম্পর্কে সলজ্জ। অন্তরে বিচলিত না হলে কবিতা লিখতেন না। স্পেন্সার তাঁকে বলেছিলেন, 'গ্রীষ্ম রজনীর নাইটিঙ্গেল।' সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে, শহর জ্বালিয়ে দিয়ে, লুটপাট করে ফেরার পথে র‍্যালে হয়তো লিখলেন এক উদাসীন প্রেমের কবিতা।

র‍্যালে ফ্যাসানের রাজা ছিলেন, ছুরির মাথায় হীরে বসিয়ে সেটা দিয়ে কাচের উপর কবিতা লিখে দেখিয়েছিলেন রানীকে। তাঁর পোশাক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যেত, সাধারণত রূপোর অঙ্গরাখা পছন্দ করতেন। বহু মূল্যবান, সকলের চেয়ে আলাদা পোশাকে র‍্যালেকে বহু ভীড়ের মধ্যেও প্রথমে চোখে পড়তো। তাঁর পোশাকের সঙ্গে অনেক হীরামুক্তা, চুনি, পান্না এমন আলগাভাবে গাঁথা থাকতো—যেন ভীড়ের মধ্যে খসে পড়লেও ক্ষতি নেই। তাঁর অন্যায় মৃত্যুদণ্ডের জন্য তাঁর এই পোশাকও অনেকটা দায়ী। রাজার চেয়েও রূপবান একজন পুরুষের রাজার চেয়েও মূল্যবান পোশাক পরার কি অধিকার আছে? অন্তত নোংরা স্বভাবের পাগলাটে রাজা প্রথম জেমস তা সহ্য করতে পারেননি।

আলু জিনিসটা ইংল্যাণ্ডের লোক খেতে জানতো না। র‍্যালে ইংল্যাণ্ডে আলুর আমদানী করলেন, যা এখন যে কোন দেশে যে কোন তরকারির অঙ্গ। প্রথম প্রথম অবিশ্বাস করে অনেকে খেতে চায়নি। কি জানি কি বিষ ফল! কিন্তু র‍্যালের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং রানী এলিজাবেথ আলু চোখ দেখবার পর সকলের ভয় ভেঙে যায়।

কিন্তু র‍্যালে সত্যি সত্যি এক মারাত্মক বিষ ইংল্যাণ্ডের লোকদের দিয়ে গেছেন—সেই সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশকে। সেই বিষের নাম তামাক। তামাক র‍্যালের জন-অপ্রিয়তার অনেকটা কারণ। গল্প আছে, র‍্যালে একা একা বসে পাইপ টানছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর পিছন থেকে এক বালতি জল ঢেলে দেয় তাঁর মাথায়। সে ভাবছিল, তার মনিবের মাথায় নিশ্চয়ই আগুন লেগে গেছে অথবা শয়তান ভর করে তাঁর মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। রাস্তা দিয়ে

র‍্যালে পাইপ টানতে টানতে গেলে ভয়ঙ্কর ভিড় জমে যেত। কোন লোক কথা বলার সময় আজেবাজে কিছু বললে র‍্যালে উত্তর না দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিতেন। একজন ছোকরা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে র‍্যালে তামাকের গুণাগুণ প্রচার করাতে লাগলেন। বুদ্ধি সাফ হয়, কাজে উৎসাহ আসে...... এই সমস্ত। 'তামাকের এত গুণ যে একখানা বইতেও লিখে শেষ করা যাবে না।'

একবার রানী এলিজাবেথের সঙ্গে র‍্যালে বাজি ফেলেছিলেন যে, তিনি ধোঁয়ার ওজন মাপতে পারেন। খানিকটা তামাক নিয়ে প্রথমে ওজন করলেন। তারপর তামাকটা পাইপে গুঁজে টানতে লাগলেন নির্বিকারভাবে। ধোঁয়া উড়ে যেতে লাগল। ধোঁয়া মাপবার কোন চেষ্টাই নেই। বিস্মিত রানী যখন আসন্ন বাজি-জেতার আনন্দে উন্মুখ, সেই সময় র‍্যালে তামাকের ছাইটুকু ওজন করলেন এবং বললেন, দুটো ওজনের যেটুকু তফাৎ সেইটুকুই ধোঁয়ার ওজন। হেরে গিয়ে রানী বাজীর গিনি দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'র‍্যালে, লোকে টাকা উড়িয়ে ধোঁয়া করে দেয় আর তুমি ধোঁয়া উড়িয়ে টাকা পেলে!' দূরদর্শিনী ছিলেন রানী, পরবর্তীকালে তামাকের উপর কর বসিয়ে ইংল্যাণ্ড বহু টাকা আয় করেছে। এবং এখন পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ টাকা উড়িয়ে ধোঁয়া করছে এবং সিগারেট কোম্পানীর মালিকরা কোটিপতি হচ্ছে।

র‍্যালের সাময়িক পতনের দুটি কারণ : এসেক্স এবং বিবাহ। রানীর সম্ভ্রান্ত সহচরী এলিজাবেথ থ্রকমর্টনের সঙ্গে গোপন প্রণয় ছিল র‍্যালের। সেকথা জানাজানি হবার পর সঙ্গে সঙ্গে র‍্যালে বিয়ে করলেন থ্রকমর্টনকে। ক্রোধান্ধ রানী দুজনকেই বন্দী করলেন টাওয়ার অব লণ্ডনে। কিছুদিন পরে ছেড়ে দিলেও বহুদিন তাঁর রাগ পড়েনি।

আর্ল অব এসেক্সের তরুণ বয়স, দেবনিন্দিত রূপ, অভিজাত বংশগরিমা, অহংকারী মুখমণ্ডল দেখে বৃদ্ধা রানী ঝুঁকে পড়লেন তাঁর দিকে। সেই সময় ওয়াল্টার র‍্যালে ছায়ায় পড়ে গেলেন। র‍্যালে এসেক্সের দু চোখের বিষ, কিন্তু র‍্যালের অনেকটা বালকের ধৃষ্টতা হিসাবে এসেক্সের প্রতি সস্নেহভঙ্গী ছিল। যদিও এসেক্সের ভয়ঙ্করতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তিনি জনসাধারণের কাছে নিন্দিত হয়েছিলেন। এসেক্স ছিলেন জনসাধারণের 'হীরো'। রানীর রোমান্টিক প্রণয়ী। কিন্তু চেহারা এবং সুকুমার স্বভাব ছাড়া এসেক্সের গুণ বিশেষ ছিল না। তাঁর অনেক প্রেমপত্র লিখে দিয়েছেন প্রখ্যাত দার্শনিক

চতুর চূড়ামণি ফ্রান্সিস বেকন। যুদ্ধেও খুব কৃতী ছিলেন না এসেক্স। দু-একবার ডুয়েলে হেরেছেন। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে র‍্যালের খ্যাতি চুরি করেছেন। মৃত্যুর আগে এসেক্স র‍্যালের প্রতি সমস্ত অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে র‍্যালের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য তাঁকে খুঁজেছিলেন, কিন্তু র‍্যালে তখন দূরে দাঁড়িয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে কান্না থামাতে পারছেন না।

এসেক্সের মৃত্যুর পর র‍্যালে আবার রানীর প্রীতিভাজন হলেন, যদিও আগের মত অতটা আর নয়। কিন্তু বছর দুয়েক পর রানীর মৃত্যুতে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এলিজাবেথ তাঁর সিংহাসনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মেরী কুইন অব স্কটকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন। এবার সেই মেরীরই ছেলে জেমস হলেন ইংল্যাণ্ডের সম্রাট। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে বহুকাল ঝগড়া। ইংল্যাণ্ড চিরকাল স্কটল্যাণ্ডের উপর আধিপত্য করতে চেয়েছে। কিন্তু এবার স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবে ইংল্যাণ্ডের সম্রাট। সুতরাং ধরেই নেওয়া হল ইংরেজ তা সহ্য করবে না। কদাকার, অপরিচ্ছন্ন, বর্বর (যদিও শিক্ষিত) সম্রাট প্রথম জেমস ইংরেজী বলতেন বিকৃত উচ্চারণে। সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাতে প্রথমেই বিষ-নজরে দেখলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেকে। অমন উদ্ধত, দীপ্ত, পরিচ্ছন্ন মূর্তিটি কে? ওকে নিপাত করো। রাজসভায় র‍্যালের শত্রু ছিল অগণ্য। তার মধ্যে র‍্যালে বন্ধু বলে মনে করতেন রবার্ট সিসিলকে। সেই রবার্ট সিসিল-ই রাজাকে মন্ত্রণা দিলেন—র‍্যালেকে বিনাশ করুন, র‍্যালেই এখন ইংল্যাণ্ডের প্রধান পুরুষ। সে ইচ্ছে করলে অনেক সর্বনাশ করতে পারে। সিসিলের আত্মীয় কবহামকে লাগিয়ে দিলেন র‍্যালেকে উত্তেজিত করার জন্য।

সহজাত অহঙ্কারী র‍্যালে সম্রাটকে বিশেষ সম্মান দেখাননি। ইংল্যাণ্ডে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা না করে একটু দেরী করেছিলেন। র‍্যালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে সম্রাটের বিকৃত ইংরেজি উচ্চারণ শুনে, র‍্যালে চমকে উঠলেন। তারপর সম্রাট জেমস জানালেন সিংহাসনের জন্য তাঁকে হয়তো অনেক লড়াই করতে হতো। র‍্যালে বলে উঠলেন, তা হওয়াই ভালো ছিল, তা হলে আপনি বুঝতে পারতেন কে আপনার বন্ধু, কে আপনার শত্রু।

এদিকে কবহাম এসে তাঁকে গরম গরম কথা শোনাতে লাগলেন—কি করে স্কটল্যাণ্ডের রাজাকে সরানো যায়—ইংল্যাণ্ড কি করে ইংরেজদের দখলে আসে। র‍্যালে শুনে যান—মাঝে মাঝে মন্তব্য করেন।

সন্দেহপ্রবণ সম্রাট প্রথমেই র‍্যালেকে দেহরক্ষীদের অধ্যক্ষ পদ থেকে হটালেন। র‍্যালে নীরব প্রতিবাদ জানালেন। তারপরই এলিজাবেথ তাঁকে যে বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন—সেই বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেওয়া হল। চূড়ান্তভাবে অপমানিত হলেন কিন্তু গণ্ডগোল করলেন না র‍্যালে।

ওরকমভাবে অপমান করলে র‍্যালের পক্ষে বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং ধরেই দেওয়া হল র‍্যালে বিদ্রোহী। এমন কি র‍্যালেকে বিদ্রোহ করার সময়ও দেওয়া হল না। রাজদ্রোহের অভিযোগে র‍্যালেকে বন্দী করা হল। রাজপক্ষে প্রধান অভিযোগকারী এটর্নী জেনারেল স্যার এডোয়ার্ড কোক্—যে ব্যক্তিটি এসেক্সকে ফাঁসী দিয়েছিলেন। কোন প্রমাণ নেই, কোন যুক্তি নেই—শুধু অকথ্য গালাগালি দিতে লাগলেন তিনি র‍্যালেকে। র‍্যালের পক্ষে কোন উকিল নেই, সাক্ষীদেরও কথা বলার অনুমতি দেওয়া হল না। আদর্শ বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষতার দেশ ইংল্যাণ্ডে এমন জঘন্য বিচারহীনতার দৃষ্টান্ত আর নেই। কারাকক্ষ থেকে যখন র‍্যালেকে বিচারালয়ে নিয়ে আসা হয়—তখন জনগণ তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল, ইট-পাটকেল ছুঁড়েছিল তাঁর দিকে, বিচারের আগেই তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বিচারের শেষে জনতা এত ভালোবেসেছিল র‍্যালেকে, এমন অভিনন্দন জানিয়েছিল যে রাজশক্তি তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে সাহস পাননি। র‍্যালে কী কী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার একটা লিস্ট করে কবহামকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হল। কবহাম সই করতে চায়নি। কিন্তু তাকে বন্দী করে বলা হল র‍্যালে তাঁর নামে সব কথা বলে দিয়েছে। তখন রাগের চোটে কবহাম সই করে। পরে কবহাম তার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলে'ঈশ্বর আমার সাক্ষী, সুতরাং আমার বিবেক কেঁপে উঠেছে।'

বিচারের দিন প্রথমে অভিযোগ পড়া হল, র‍্যালে কবহামের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল, রাজাকে সরিয়ে লেডি আরাবেলাকে সিংহাসনে বসাতে, দেশে রাজদ্রোহ জাগাতে, ধর্ম বদলাতে এবং রোমের কুসংস্কার নিয়ে আসতে, এবং বিদেশী শত্রুকে (স্পেন) ইংল্যাণ্ড আক্রমণে প্রলুব্ধ করতে।

তারপর এটর্নী জেনারেল কোক্ বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমে নির্লজ্জ ভাষায় সম্রাটের গুণগান। তারপর র‍্যালের দিকে ফিরে—তুমি একটি ঘৃণ্যতম শয়তান। আমি সব প্রমাণ করবো। তুমি একটি দৈত্য। তোমার মুখটা ইংরেজদের মত, হৃৎপিণ্ডটা স্প্যানিশ। তুমি, তুই একটা বিশ্বাসঘাতক।

চাকর বাকরের মত অসম্মান করে কথা বলা, তারপর যে লোক স্পেনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাকে স্প্যানিস-হৃদয় বলা—চরম আপত্তিকর। কিন্তু র‍্যালে সংযম হারালেন না, শান্তভাবে বললেন, আপনি আসল বিষয়ে কথা বলুন। কিন্তু র‍্যালেকে উত্তেজিত করাই কোকের উদ্দেশ্য।…বললেন, আমি প্রমাণ করবো, এ পর্যন্ত আদালতে যারা এসেছে তুমি তাদের মধ্যে কুখ্যাততম দেশদ্রোহী—তুমি পৃথিবীর জঘন্যতম, কুৎসিততম দেশদ্রোহী .।

এবার র‍্যালে বললেন, আপনি অসংযমী, অভদ্র এবং অসভ্যের মত কথা বলছেন।

—তোমার বিষাক্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করবার জন্য আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

—সত্যিই আপনি ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ আপনি এক কথাই বারবার বলছেন।

এ-কথায় সভার মধ্যে হাসির রোল উঠল। কোক্ আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন,—তুই একটা দূষিত লোক, তোর অহংকারের জন্য সারা ইংলণ্ডের লোক তোর নামে ঘৃণা বোধ করে।

—আমি তাহলে আপনার কাছে যাই এবং মেপে দেখা যাক আপনার আর আমার মধ্যে কে বেশী বা কম ঘৃণ্য!

সভায় আবার হাসির রোল। এটর্নী কোক্ বিষম উত্তেজিত। আর র‍্যালে অবিচলিত, তাঁর চোখে কখনো বা কৌতুক ঝক্‌ঝক্ করছে।

এরপর কোক্—সেই কোবহামের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা চিঠিটা পড়ে শোনালেন। তখন র‍্যালে হঠাৎ বললেন যে, তিনি ইতিমধ্যে কোবহামকে গোপনে একটা আপেলের মধ্যে ভরে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এবং কোবহাম ক্ষমা চেয়ে উত্তর লিখেছে। সেই চিঠি পড়ে শোনানো হোক। কেন র‍্যালে এমনভাবে চিঠি পাঠিয়েছেন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কারণ সত্য প্রকাশ করতে অনুরোধ করা অন্যায় নয়।

কোক্ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, না সত্য প্রকাশ করা হবে না এবং চিঠিতে কি লেখা ছিল তাও জানানো হবে না।

—তাহলে আমাকে নিজেকেই উত্তর জানাতে দিন।

—না, তা পারবে না।

—কিন্তু এটা আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ব্যাপার।

—না, কোবহাম যা করেছে, তা তোমারই মন্ত্রণায় করেছে, শয়তান। আমি তোমাকে হীন বিশ্বাসঘাতক হিসাবে প্রমাণ করে দেব।

—না, মিঃ এটর্নী, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি মরি আর বাঁচি, আমি খাঁটি নাগরিক হিসাবে দাঁড়াতে চাই। আপনার ইচ্ছে হলে আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারেন—কিন্তু কোন গুণ বা ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকের তা বলা উচিত নয়। আমি আপনার মুখ থেকে এখন পর্যন্ত একটিও খাঁটি অভি-যোগের কথা শুনিনি।

তাঁর বক্তব্যের সরলতায় বিচারক পর্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি বললেন, মিঃ এটর্নী কথা বলছেন তাঁর কর্তব্যের দিক থেকে। এবং স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে কথা বলছেন নিজের জীবন নিয়ে। উভয়পক্ষই ধৈর্য ধরুন।

কোক্ ধৈর্য দেখালেন আরও কিছু গালমন্দ করে। তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কথায় কি আপনার রাগ হচ্ছে'?

—না, আমি ক্রুদ্ধ হইনি।

কোকের ব্যবহৃত কথাগুলি সম্পর্কে পরবর্তীকালে আইনজীবী এবং সমালোচকরা বলেছেন, আদালতে ব্যবহৃত কুৎসিততম ভাষা। বিনা প্রমাণে বারবার র‍্যালেকে আঘাত করা হতে লাগলো। র‍্যালে তাঁর পক্ষে সাক্ষী চাইলেন—পেলেন না। কোবহামকে আদালতে আনতে বললেন। আনা হল না। কোন দলিল নেই। র‍্যালে প্রত্যেক কথার এমন উত্তর দিয়েছিলেন যে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন কবিত্বময়, সরস, প্রগাঢ় জ্ঞানমণ্ডিত যে, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি লোক বিশ্বাস করলো যে র‍্যালে নির্দোষ। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে র‍্যালে সেই অল্প ক'দিনেই অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যারা তাঁর অহংকারের জন্য ক্রুদ্ধ ছিল তারা এখন তাঁর ধৈর্য এবং মনীষা দেখে স্তব্ধ হল।

তবুও এইরকম বিচারে র‍্যালের শাস্তি হল। আগে হাত পা কেটে, তার-পর পেট চিরে, তারপর মুণ্ডপাত করে মৃত্যুদণ্ড। রাজা জেমস যে কতটা নিষ্ঠুর ছিলেন রাজা হবার কয়েকদিন পরই তিনি একটি পকেটমারকে বিনা বিচারে ফাঁসী দিয়ে তা প্রমাণ করেছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে দেরী হতে লাগলো, রাজা এবং বিচারকরা র‍্যালের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বন্দী করে রাখা হল তাঁকে টাওয়ার অব লণ্ডনে। পৃথিবীতে তখন তাঁর বিচার নেই, বন্ধু নেই। হয়তো এই অবস্থার কথাই তিনি আগে লিখেছিলেন।

'Tell fortune of her blindness
Tell nature of decay ;

Tell friendship of unkindness
Tell justice of delay ;
And if they will reply ;
Then give them all the lie.'

তের বছর বন্দী হয়ে রইলেন র‍্যালে। অসহ্য সেই জীবন। কোনোদিন মুক্তি পাবার আশা নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজাকে জানালেন যে, যদি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় তবে তিনি গায়নাতে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করে রাজাকে অতুল সম্পদ এনে দেবেন। লোভী রাজা রাজী হলেন। মুক্তি পেয়ে, 'সমুদ্রের রাখাল' আবার বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। কিন্তু র‍্যালের এবারের অভিযান সফল হল না। যাবার পথে স্প্যানিসদের সঙ্গে লড়াই বাধল। প্রাণপণে হিংস্রভাবে লড়লেন র‍্যালে,—কিন্তু যুদ্ধে তাঁর ছেলে মারা গেল, বহু সৈন্যক্ষয় হল, কিন্তু স্প্যানিসদের পার হওয়া গেল না। ভগ্ন-মনোরথ র‍্যালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্দী হলেন এবং সেই তের বছর আগেকার পুরোনো মৃত্যুদণ্ড এখন কার্যকর করার হুকুম হল। এবারের এই ঘটনাও র‍্যালের অসাধারণ অভিজাত ভদ্রতার উদাহরণ। বন্দীত্ব থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন এই শর্তে যে রাজাকে ধনরত্ন এনে দেবেন। ধনরত্ন আনতে না পারলেও তিনি অনায়াসেই অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারতেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু ফিরে এসে র‍্যালে বললেন, আমি সার্থক হতে পারিনি, কিন্তু কথা রেখেছি।

বধ্যমঞ্চে উঠেও র‍্যালে সমান প্রফুল্ল, তেজী সাহসী পুরুষ। নিজেই নিজের কোট খুলে ফেললেন—তারপর ঘাতককে বধ্য-কুঠারে ধার আছে কি না দেখাতে বললেন। ঘাতক দ্বিধা করছিল, তিনি বললেন, আমি অনুরোধ করছি আমাকে দেখতে দাও—হাত দিয়ে দেখে খুশী হয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে সত্যকারের ধারালো ওষুধ যাতে সব অসুখ সেরে যায়'। ঘাতক তাঁর কাছে নিচু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। র‍্যালে তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং চোখ বেঁধে ফেলতে রাজী হলেন না, "আমি কুঠারকেই ভয় পাই না, তার ছায়া দেখে ভয় পাবো ?" তারপর নিজেই কাঠের উপর মাথা রাখলেন। তখন পুরোহিত এসে বললেন, ধর্মমতে পূর্বদিকে মাথা রাখা উচিত—র‍্যালে তাঁকে বিদায় করলেন এই বলে, "যদি হৃদয় ঠিক থাকে তবে মাথা যেদিকেই থাকুক কিছু আসে যায় না"। তারপর র‍্যালে হাত তুলে ঘাতককে ইঙ্গিত করলেন। ঘাতক চুপ। আবার ইঙ্গিত করলেন। ঘাতক তবুও চুপ। প্রতীক্ষমান জনতার

মধ্যে উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়ার মত দেখা দিল। অনেকে আশা করতে লাগলো হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনো অলৌকিক উপায়ে র‍্যালের জীবন রক্ষা পাবে।

কিন্তু অহংকারী র‍্যালে ঘাতককে আদেশ করলেন, 'ভয় পাচ্ছো কেন? আঘাত করো, ওহে, আঘাত করো'! ঘাতক এবার আদেশ পালন করলো। কুঠারটি পর পর দুবার পড়লো। জনতার মঞ্চ থেকে গগনভেদী ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল, কিন্তু র‍্যালের মুখ দিয়ে একটি শব্দও নয়।

বহুদিন বাদে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের ছেলেকে রাজসভায় দেখে সম্রাট প্রথম জেমস ভয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন, "ঐ ছেলেটির মধ্যে আমি ওর বাবার প্রেতাত্মা দেখতে পাচ্ছি!" কথাটা হয়তো ঠিকই। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে র‍্যালের প্রেতাত্মাই শেষ পর্যন্ত স্টুয়ার্ট রাজবংশকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে।

মৃত্যু থেকে ফিরে এসে অমর ডস্টয়েভস্কি

প্রথম তিনজনকে তিনটি দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে, পনেরটি রাইফেল উদ্যত, এর পরই ডস্টয়েভস্কির পালা—আর কয়েক মিনিট বাদেই মৃত্যু। তখন ডস্টয়েভস্কির বয়েস সাতাশ,—'পুয়োর ফোক' এবং 'দি ডাবল' এই দুটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস এবং কিছু ছোটগল্প লিখেছেন মাত্র তিনি তখন রাশিয়ার সাহিত্যে বিস্ময়কর উদীয়মান প্রতিভা এবং সে সময় তাঁর মৃত্যু হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হিসাবে গণ্য হতেন কিছুদিন এবং বিস্মৃত হতেন শতাব্দী শেষ হবার আগেই। তাহলে 'নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডার গ্রাউণ্ড', 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট', 'দি ডেভিল্স' ('দি পসেস্ড' নামেই এখন বেশী পরিচিত), 'ব্রাদারস কারামাঝোভ' —এই উপন্যাসগুলি লেখা হত না—এবং এই ভয়ঙ্কর অপ্রতিরোধ্য গ্রন্থগুলিকে বাদ দিলে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসও কিছুটা অন্যরকম হত। নির্যাতিত, অপমানিত মানুষের অমর জয়-গাথা, দ্বিধা-বিভক্ত মানুষের আত্মহনন এবং পরিশুদ্ধির আখ্যান রচিত হবার জন্য মহাসময়কে আরও অপেক্ষা করতে হতো। তখনও পর্যন্ত সেই লাজুক নম্র যুবকটি পৃথিবীর প্রায় কিছুই দেখেননি, তখনো মুক্তি পায়নি তাঁর বুকের ভিতরের প্রমত্ত বাতাস।

কিন্তু সে সময় ডস্টয়েভস্কির মৃত্যু হয়নি। তাঁর পরেও প্রায় তেত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু চরম মুহূর্তে আবার বেঁচে ওঠা মৃত্যুরও অধিক। বধ্য-ভূমি থেকে ফেরার পর দীর্ঘ কারাজীবনের যে-বর্ণনা তিনি পরে লিখেছেন তার নাম দিয়েছিলেন, 'হাউস অব দি ডেড্'। তাঁর এই মৃত্যুদণ্ডের নাটকীয় ঘটনাটিকে ট্র্যাজেডি বলা উচিত না প্রহসন, তা ঠিক করা দুরূহ। এমন মর্মান্তিক করুণ এবং নিতান্ত হাস্যকর ঘটনার সমাবেশ আর কোন বিখ্যাত মনীষীর জীবনে হয়তো ঘটেনি।

জীবনে এমন বহু কাজ করেছেন ডস্টয়েভস্কি যাকে হয়তো বলা যেতে পারে অন্যায়। কিংবা পাপ। যেমন, নিজেকে তিনি মনে করতেন পিতৃহন্তা। বহু লোকের টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে পারেন নি, নিজের স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে উপবাসে রেখে জুয়া খেলে শেষ কপর্দক উড়িয়েছিলেন বহুবার। ন-দশ বছরের একটি বালিকার উপর স্নানাগারে শারীরিক অত্যাচার করেছিলেন (খুব সম্ভবতঃ এ ঘটনাটি সত্যি নয়। তাঁর 'দি পসেস্ড' উপন্যাসে এ-রকম একটি পরিস্থিতির বর্ণনা আছে, অন্যান্য বহু রচনাতেই বয়স্ক পুরুষ ও বালিকার

সম্পর্কের কথা দেখা যায়, তাঁর নিজের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেও বয়সের তফাৎ ছিল প্রায় পঁচিশ বছর। ঐ কাহিনী নিজের মুখে বলেছেন অনেকবার এবং বলেছিলেন 'আমিই সেই স্কাউণ্ডেল যে ঐ কাজ করেছে'। কিন্তু তিনি যে সত্যিই করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই, সম্ভবতঃ অন্যান্য বহু ঘটনার মত এটাও একটি ডস্টয়েভস্কির বদ্ধমূল ভুল বিশ্বাস। তাঁর মৃত্যুর পর এক বন্ধু টলস্টয়কে চিঠিতে এ ঘটনা লিখে জানান। এ সম্পর্কে গল্পটি এই, স্নানাগারে ঐ কুকীর্তিটি করার পর ডস্টয়েভস্কি অত্যন্ত অনুতপ্ত, শোকার্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়েন—তখন তাঁর বন্ধুরা বলে যে পাপ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল পরিতাপ এবং স্বীকারোক্তি। যে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু তার কাছেই স্বীকোরোক্তি দেওয়া উচিত। কে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু? এ কথা ভেবে ভেবে ডস্টয়েভস্কি শেষ পর্যন্ত টুর্গেনিভকে নির্বাচন করলেন এবং তাঁর কাছে স্বীকোরোক্তি করলেন।)—কিন্তু এ সমস্ত অবৈধ কাজের জন্য ডস্টয়েভস্কি কোন শাস্তি পান নি। যে জন্য তিনি এ ভয়াবহ, অমানুষিক শাস্তি ভোগ করেছিলেন, তা নিতান্ত তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর। অকারণেই প্রায় বলা যায়।

ডস্টয়েভস্কির জন্ম হয় রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় একশো বছর আগে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর। বাবা ছিলেন মিলিটারী ডাক্তার। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বেরুবার আগেই বাবা ও মা দুজনেরই মৃত্যু হয়। যখন মায়ের মৃত্যু হয়, ডস্টয়েভস্কি প্রায় বালক। সেই সময়ই মৃত্যু হয়েছিল মহাকবি পুশকিনের। মায়ের মৃত্যুর সমান কিংবা বেশী শোক বালক ডস্টয়েভস্কি পেয়েছিলেন তাঁর কল্পনার সম্রাট পুশকিনের মৃত্যুতে। মায়ের কবরখানায় চুপি চুপি তিনি দাদাকে বলেছিলেন, 'এসময় যদি মায়ের মৃত্যু নাও হত, তাহলেও আমি পুশকিনের জন্য শোকের কালো পোশাক পরতাম, জানিস'। তাঁর দাদা মিখায়েলও কিছুদিন কাব্য চর্চা করেছিলেন—পুশকিন ছিলেন তাঁরও প্রাণাধিক।

ছেলেরা থাকতো বোর্ডিং-এ, বাবা গ্রামের বাড়িতে একটি চাষীর মেয়েকে নিয়ে দিন কাটাতেন। ছেলেদের সঙ্গে বেশ নির্দয় ব্যবহার করতেন তিনি, বিষম কৃপণতা করতেন। সামান্য অর্থ চেয়ে কত কাতর চিঠি লিখেছেন ডস্টয়েভস্কি তাঁর বাবার কাছে। অবশেষে একদিন গ্রামের চাষীদের হাতে খুন হলেন মাইকেল ডস্টয়েভস্কি। এই বিখ্যাত লেখকের পিতা পুত্রের প্রতিভা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাসও পেয়ে যাননি। বহুদিন পর একজন বৃদ্ধ চাষী যখন

শোনে যে তাদের গ্রামেরই ছেলে ফিয়োডোর ডস্টায়েভস্কির খুব নাম হয়েছে দেশে—তখন সে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'যার বাবা অত দুশ্চরিত্র এবং খারাপ লোক ছিল সে কখনো বিখ্যাত হতেই পারে না।' পিতার অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে সারাজীবন ডস্টয়েভস্কির মধ্যে একটা অবচেতন অপরাধ বোধ ছিল, মনে মনে তিনি নিজেকে মনে করতেন পিতার হত্যাকারী। তাঁর জীবনের শেষ রচনায় 'ব্রাদার্স কারামাঝোভ'-এ নিজের পিতার চরিত্রের প্রতিফলন আছে।

জীবনে বহু কষ্ট এবং লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন কিন্তু প্রায় প্রত্যেক তরুণ লেখকেরই যে দুর্ভোগ অবশ্য প্রাপ্য—সেই সম্পাদকের অবহেলা কিংবা প্রকাশকদের ঔদাসীন্য তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। লেখার প্রথম চেষ্টাতেই তিনি অসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছিলেন।—যেন চমৎকার এক ভোরবেলা চোখ মেলে দেখলেন যে তিনি বিখ্যাত। তখন তাঁর বয়েস বাইশ বছর। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে পাস করে সরকারের অধীনে চাকরি করেছিলেন অল্প কয়েকদিন—অত্যন্ত অনিচ্ছা চাকরিতে, তাই তিনি ঠিক করলেন ওসব চাকরি ওঁকে ছাড়তে হবে—তাঁকে প্রবেশ করতে হবে সাহিত্য জগতে। সে-চাকরির মাইনে সামান্য, সুতরাং অর্থাভাব। এই অর্থাভাব শুরু-হয়েছে ডস্টয়েভস্কির স্কুল জীবন থেকে এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁকে আশ্রয় করে ছিল। টাকা তাঁর পকেটে এলেই জলন্ত কয়লার মত হয়ে যেত এবং অবিলম্বে পকেট ফুটো করে বেরিয়ে যেত। জীবনের প্রথম থেকে শেষ রচনাটি পর্যন্ত তিনি লিখেছিলেন অর্থের তাড়নায়, অর্থাভাব মেটানোর জন্য। তাঁর আত্মা বন্ধক দেওয়া থাকতো প্রকাশকদের কাছে, না লিখলে তাঁর মুক্তি নেই বলেই তাঁকে লিখতে হতো।

সেই সদ্য যুবা বয়সেই অর্থাভাব মেটাবার জন্য লেখার পেশা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে ভাবলেন জর্জ সাঁদ, বালজাক কিংবা শীলার—এঁদের রচনা অনুবাদ করে নিজে ছাপবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না প্রাথমিক অর্থের অভাবে। তারপর নিজে একটি ছোট উপন্যাস লিখলেন—সেটাকেও নিজে নিজে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা তাঁর। এমন কি তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা যখন বলেছিল—নিজে প্রকাশ করায় অনেক অসুবিধে—তার চেয়ে কোন পত্রিকায় পাঠাতে—তখন সেই তরুণ লেখক অহঙ্কারের সঙ্গে বলেছিলেন, আমি তো নাম কিংবা হাততালির জন্য লিখছি না—আমি লিখছি টাকার জন্য, বেশী টাকা পেতে চাই। এবারেও শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের মূল অর্থ পাওয়া গেল না,

সুতরাং যেতেই হল প্রকাশকের কাছে—সন্ত শেষ করেছেন সেই ছোট উপন্যাসটি, নাম 'পুয়োর ফোক'।

এক বন্ধুর মারফত রচনার পাণ্ডুলিপিটি একদিন পাঠিয়ে দিলেন—তখনকার দিনের খ্যাতিমান কবি নেক্রাসভের কাছে—তারপর সারা সন্ধ্যে ছটফট করে কাটালেন—একটি চেনা ছেলের বাড়িতে গিয়ে গোগোলের 'মৃত আত্মা' নামের বইটা পড়লেন, সব সময় অস্বস্তি, গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এলেন, খুবই অস্বস্তি লাগছে, ঘুম আসছে না,—তাঁর রচনাটি এখন নেক্রাসভের কাছে।

নেক্রাসভ সেই বই পড়তে দিলেন বিখ্যাত সমালোচক বেলিনস্কিকে। বেলিনস্কি শেষ পর্যন্ত পড়ে গ্রন্থকারকে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে চাইলেন। তাঁকে বলা হল নতুন গোগোল, বলা হল আশ্চর্য প্রতিভা! নেক্রাসভ তাঁর রচনা প্রকাশ করবার জন্য আড়াইশো রুবল পারিশ্রমিক দিলেন। শুধু লেখকদের মধ্যেই নয়—সাধারণ পাঠকদের কাছেও 'পুয়োর ফোকে'র লেখক এক বিস্ময় হয়ে রইলো। সদ্য ফরাসী দেশ থেকে ফেরা অভিজাত টুর্গেনিভ তপ্ত বন্ধুত্ব জানালেন এই নবীন লেখককে। খ্যাতি ডস্টয়েভস্কিকে বিমূঢ় করেনি, এক রাত্রে একটি গল্প শেষ করে পরদিন সকালে তিরিশ রুবলে সেটা বিক্রি করলেন —গল্পটি টুর্গেনিভের ঘরে উচ্চকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন—গল্পের নাম, 'নয়টি অক্ষরে একটি উপন্যাস'। পর পর কয়েকটি গল্পের পর আবার উপন্যাস লিখলেন, 'দি ডাবল্'। লেখক হিসাবে ডস্টয়েভস্কির স্থান দৃঢ় হয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি টুর্গেনিভ এবং বেলিনস্কির কাছ থেকে ভর্ৎসনা পেলেন অসংযত জীবন যাপনের জন্য। নেক্রাসভের সঙ্গে মতবিরোধ, এবং বিচ্ছেদ হয়ে গেল। বেলিনস্কি কাগজে তাঁর সমালোচনা করে যথেষ্ট নিন্দে করলেন, 'দি ডাবল'-এর সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করলেন। লিখলেন, ওসব ভূতুড়ে ঘটনা এযুগে অচল, ও রকম পাগলামি ডাক্তারদের বিষয় হতে পারে—লেখকদের নয়।

রাস্তা দিয়ে কিছু লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রায় চলেছে—ডস্টয়েভস্কি এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে, ঐ দৃশ্য তাঁর সহ্য হল না, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিছুদূর গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন রাস্তায়। মৃগী রোগের লক্ষণ—সর্বাঙ্গ কাঁপছে। আর একবার, এক পার্টিতে ডস্টয়েভস্কি বেশ সহজভাবেই মেতে ছিলেন, হঠাৎ শেষের দিকে তাঁর মুখ চোখ বদলে গেল, অদ্ভুত ভয় ফুটে উঠলো তাঁর সর্বশরীরে, শূন্যগর্ভ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আমি কোথায়?'—তারপর বাতাস নেবার

অন্য ছুটে গেলেন জানালার কাছে। তাঁর মুখে এবং মাথায় কিছুটা ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়া হল—কিন্তু ডস্টয়েভস্কি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়, উন্মত্তের মত দৌড়তে লাগলেন—পিছনে পিছনে ভয়ার্ত গৃহকর্তা ছুটে গেলেন। হঠাৎ ডস্টয়েভস্কি উঠে বসলেন একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়িতে। তাঁর অনুসরণকারী বহুক্ষণ বাদে তাঁকে খুঁজে পেলেন এক হাসপাতালের দরজায়। তখন তিনি শান্ত, সুস্থিরভাবে বাড়ি যেতে সক্ষম। বারবার, কোন নির্দিষ্ট ব্যবধান না রেখে, সারাজীবন ডস্টয়েভস্কি এই স্নায়বিক রোগে ভুগেছেন। প্রতি আক্রমণের পর দুতিনদিন তাঁর শরীর ভেঙে থাকতো। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড এই অসুখের কারণ সম্বন্ধে বলেছেন 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'। তিনি পিতাকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন এবং ঘৃণা করতেন। পিতার স্নেহ পাবার বাসনা ছিল মাতৃহীন বালকের—তার বদলে পেয়েছিলেন ভয় এবং ঘৃণা। ফলে, মনে মনে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু চাইতেন। বাবাকে হয়তো আবেগভরে অনেক চিঠি লিখেছেন। বাবা তার সংক্ষিপ্ত উত্তর পাঠালেন অতিশয় রুক্ষ এবং নির্দয়ভাবে। তখন বালক ডস্টয়েভস্কি মনে মনে ভাবতেন, একদিন আমি ঐ বদমাস লোকটাকে খুন করবো। পিতার হত্যা-সংবাদ তাঁর কাছে যুগপৎ আনন্দের এবং ভয়ঙ্কর। কতকগুলি দুবৃর্ত্তের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—কিন্তু তাঁর নিজের হাতও কি পিতৃরক্তে রঞ্জিত নয়? কাজে না হোক, চিন্তায় কি তিনি পিতৃহত্যা করেন নি? এই পাপবোধ তাঁর জীবনকে পরিবর্তিত করেছে! সাধারণত মৃত্যুসংবাদ বা মৃত্যু দৃশ্যতেই তাঁর মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা যেত। পথে শোকযাত্রা এবং বেলিনস্কির মৃত্যু সংবাদ তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

প্রতি শুক্রবার ডস্টয়েভস্কি এক সান্ধ্য আড্ডায় যেতেন। পুরোনো ভাঙা বাড়ি, অন্ধকার সিঁড়িতে একটা লণ্ঠন থেকে আলোর বদলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে, তেল পোড়ার গন্ধ—সেখান দিয়ে উঠে আসতেন একটা গুমোট বসবার ঘরে, পেট্রাসভস্কির আসরে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি, সেখানে কিছু লোক বসে আছেন, তাঁরা কেউ সরকারী অফিসের করানী, কেউ শিক্ষক, সাহিত্যিক, ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এঁরা সব বিপ্লবী। এঁরা এখানে বসে তর্কবিতর্ক বক্তৃতা করতেন। সম্রাট, ঈশ্বর, পরিবার, দাসপ্রথা—এইসব আক্রমণ করে কথাবার্তা হতো। ডস্টয়েভস্কি অধিকাংশ সময়ই একা কোণে বসে চুপ করে শুনতেন। মাঝে মাঝে যখন কথা বলতেন, তাঁকে মনে হত খুবই আন্তরিক। সেখানে পেট্রাসভস্কির একটি ছোট লাইব্রেরী

ছিল—কিছু নিষিদ্ধ বিদেশী বই পাওয়া যেত সেখানে। ইউটোপিয়ানদের মতবাদ, বিশেষত, ফুরিয়েরের, তাঁদের প্রিয় ছিল। তাঁরা এক সরল অনাড়ম্বর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন—যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি এক হয়ে মিশে থাকবে। —সেই আড্ডায় তাস খেলা নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে ভোজ হত রাত্রে —ভোজ সভায় বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ। একদিন এক উত্তেজিত বক্তা বললেন, আমাদের কাজ শুধু আলাপ আলোচনা কিংবা স্বপ্ন দেখা নয়,—চতুর্দিকে এই অত্যাচার, ধ্বংস, দারিদ্র্য অপমানের অবসান ঘটিয়ে আনন্দময়, সুখী পৃথিবী স্থাপন করতে হবে। কাজ চাই, আর কথা নয়।

প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সেখানে উপস্থিত হতেন তাঁরা কেউ কর্মী দলের নন, সকলেই বুদ্ধিজীবি। কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ সমিতি ছিল না সেখানে, সত্যিকারের বিপ্লব ঘটাবার শক্তি ছিল না কারুর। তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল চিন্তার মুক্তি আনা, দেশের মুক্তি নয়। তবুও নানারকম পরিকল্পনা হত—একটা প্রেস খুলে গোপনে নিষিদ্ধ পুঁথি ছাপাবার কথা হয়। প্রেসের যন্ত্রপাতিও কিছু কেনা হল—প্রেসের ভার দেওয়া হয়েছিল উৎসাহিত ডস্টয়েভস্কিকে। কিন্তু সে প্রেস থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অক্ষরও ছাপা হয়নি। একজন পদস্থ সামরিক অফিসার একটি প্রবন্ধ পড়ে শোনালেন—তাতে আছে যে—খড় মেশানো অশ্ব-পূরীষের মত যে খাদ্য কৃষকেরা খায় সম্রাট নিকোলাস জারকেও কিছুদিন সেই খাদ্য খাওয়ান উচিত। তাহলে তিনি গরীবের দুঃখ বুঝতে পারবেন। একটা গোপন 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ' স্থাপনের কথাও হল। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে তাঁর জ্যোতিদাদার যে বাক্‌সর্বস্ব বিপ্লবী সমিতির হাস্যরসাত্মক বর্ণনা আছে—পেট্রাসভস্কির শুক্রবারের আড্ডাও তার চেয়ে খুব ভয়াবহ কিছু ছিল না। কিন্তু এই দলের মধ্যেও গোয়েন্দা ঢুকেছিল—এই সামান্য বিষয়গুলি সাত কাহন করে জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে।

একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে ডস্টয়েভস্কি দেখলেন, তাঁর ঘরে পুলিস। কোনো যুক্তি না দেখিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল। এবং বন্দী করে রাখা হলো দুর্গে। তাঁর বই এবং পাণ্ডুলিপি রয়ে গেল বাড়িতে, তাঁর নিজের পোশাক খুলে নেওয়া হল, তাঁর নাম পর্যন্ত মুছে দেওয়া হল একটি নম্বরে—সাত নম্বর কয়েদী। আলোহীন ছোট্ট কুঠরীতে একা আবদ্ধ, কোন মনুষ্য কণ্ঠ নেই, সারাদিনে চাবির শব্দ বা শান্ত্রীর জুতোর আওয়াজ ছাড়া কিছু নেই, একা। এমন কি একটুকরো কাগজকলমও নেই। কি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কি শাস্তি হবে—কিছুই জানেন না। আমি তো ষড়যন্ত্রকারী নই,

আমি লেখক এবং মনে মনে খাঁটি খ্রীষ্টান এবং দেশপ্রেমিক। তবে?

দিন পনের বাদে তাঁকে অনুসন্ধান বোর্ডের সামনে হাজির করা হল। তাঁর শিক্ষা, আয়, কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে চেনা পরিচয় এইসব জিজ্ঞাসা শুধু। চার সপ্তাহ পরে আর একবার শুনানী—মৌখিক উত্তরের সঙ্গে তাঁকে কাগজ কলমে উত্তরগুলি লিখে দিতেও বলা হল।

ডস্টয়েভস্কি স্বীকার করলেন তিনি কোন কোন উপলক্ষে শুক্রবার পেট্রাসভস্কির আসরে গিয়েছিলেন। 'কিন্তু কে আমার আত্মা দেখছে'?—তিনি নিজে প্রশ্ন করলেন, 'আমি যে বিপ্লবী বদমাস ফন্দীবাজ,—এই সব অভিযোগ করা হয়েছে—কিন্তু তার কতটা আমি ছিলাম—তা কে পরিমাপ করেছে?'

'আমি সেখানে দু'একবার বক্তৃতা দিয়েছি—কিন্তু কোন রাজনৈতিক বিষয়ে নয়। কখনো কখনো উত্তপ্তভাবে আমি আমার মত ব্যক্ত করেছি—কিন্তু সে উত্তেজনা সাময়িক। আমার সুনামই এই যে—আমি নিজের মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করতে পারি না। আমার বন্ধুরও সংখ্যা খুব কম—এবং তাদের জন্য ব্যয় করবার মত সময় আরও কম। অন্য সকলের মত আমিও সেন্সর প্রথা, পশ্চিম ইওরোপের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বাড়িতে আলাপ আলোচনা করেছি। শ্বাসরুদ্ধ করা নাটক সেখানে উন্মুক্ত হচ্ছে—শতাব্দীর প্রাচীন প্রথা ভেঙে যাচ্ছে। যে দেশ থেকে রাশিয়া তার সংস্কৃতি পেয়েছে (ফরাসী দেশ) সেখানকার কথা আলোচনা করা কি অন্যায়? ফরাসী দেশে যা ঘটছে তার হয়তো ঐতিহাসিক উপযোগিতা আছে—কিন্তু তা স্বৈরতন্ত্রের শত্রু হবে এর কোন মানে নেই। আমাকে তাহলে শিক্ষিত করে কি লাভ হয়েছে যদি আমি মাঝে মাঝে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে না পারি···?'

'হ্যাঁ, আমি বেলিনস্কির চিঠি (নিষিদ্ধ) একদিন সভায় পড়েছিলাম—কিন্তু সেই সঙ্গে গোগোলের উত্তর পড়েছি। ভাবে ভঙ্গীতে বা কণ্ঠস্বরে আমি মত প্রকাশ করিনি সে সময়। প্রকৃতপক্ষে, আমি বেলিনস্কির ধারণারই বিরোধী'।

ডস্টয়েভস্কি আরও বললেন, তাঁদের আসরে যা কথা হতো সবই নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সবসময়ই, পেট্রাসভস্কিকে ভয়ংকর লোক মোটেই মনে না হয়ে বরং মজার লোক মনে হত। তিনি নিজে একজন ইতিহাস ও অর্থনীতির অনুরক্ত ছাত্র—সেই হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের সব দিক খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছেন কিন্তু নিজে সমাজতন্ত্রবাদী মোটেই নন।···

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ডস্টয়েভস্কি পরিতাপ বা আত্মসমর্পণ করেন নি, অথবা নিজের প্রতি অভিযোগগুলি অপরের উপর আরোপ করতেও চাননি। তাঁর দলের কয়েকজন শেষ পর্যন্ত তা করেছিল যদিও। তদন্ত সমিতি ধীর অলস-ভাবে চলতে লাগলো, অফিসারদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী এবং এরই নাম সরকারী ভাষায় 'বিচার'। আর এই দীর্ঘ সময় বন্দীরা জেলে রইলো। ডস্টয়েভস্কির মনে হতে লাগলো…তাঁর কোন গতকাল ছিল না—তাঁর কোন আগামী কাল নেই। অনুসন্ধান বোর্ড শেষ পর্যন্ত পেট্রাসভস্কির বাড়িতে বৈঠক ছাড়া কিছুই জানতে পারল না—আর সেই কারণেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে আটাশজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিল—তার মধ্যে ডস্টয়েভস্কি একজন এবং উল্লেখযোগ্য অপরাধী। ডস্টয়েভস্কির কোন বিবৃতি দেবার আছে কিনা জানতে চাওয়া হল, তিনি লিখে জানালেন, 'আমি সরকারের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্বেষমূলক কাজ করিনি। যা আমি করেছি তা সবই আগে থেকে না ভেবে, সাময়িকভাবে—যেমন বেলিনস্কির চিঠি পড়া। যদি আমি কখনো স্বাধীনভাবে আমার মত প্রকাশ করে থাকি তবে তা বলেছি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে যারা আমার কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে এবং আমাকে যারা চেনে। আমি আমার সন্দেহ মোচন করবার জন্য কখনো কোন উপায় খুঁজে বেড়াইনি'।

আরো কিছুদিন নির্জন কারাবাসের পর ডস্টয়েভস্কি শরীরে শীতের দাঁত অনুভব করলেন। তাঁরা বন্দী হয়েছিলেন এপ্রিল মাসে। তিনি জানতেও পারলেন না যে বিচারকরা আরও চোদ্দজনের সঙ্গে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। যথাসময়ে আদালতের রায় চূড়ান্ত বিচারকের কাছে দেওয়া হল। জুরীরা বললেন, এরা সকলেই যথার্থ অপরাধী এবং যেহেতু রাজনৈতিক অপরাধের দলপতি এবং অনুচরদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, সেজন্য সকলেই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। যাই হোক, আসামীরা যেহেতু সকলেই যুবক এবং অনুতপ্ত এবং পরিকল্পনাগুলি একটাও কাজে লাগাবার সময় পায়নি—সুতরাং তাদের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হোক। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ডস্টয়েভস্কির স্থান দশম—তাঁর আট বছরের কারাদণ্ড। তালিকার শীর্ষে পেট্রাসভস্কি—তাঁর আজীবন!

শেষ সম্মতির জন্য এই নির্দেশ পাঠানো হল সম্রাটের কাছে। মহানুভব সম্রাট নিকোলাস বন্দীদের প্রতি উদারতা দেখাতে চাইলেন। মৃত্যুদণ্ড রহিত রায় তিনি সম্মতি দিলেন, কারুর কারুর কারাদণ্ড হ্রাস করলেন—ডস্টয়েভস্কির

নামের পাশে তিনি লিখলেন—কারাদণ্ড চার বৎসর, এবং তারপর নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈনিক জীবন। এত সামান্য কারণে লোকগুলিকে এই রকম নির্দয় শাস্তি দেবার কারণ ফরাসী বিপ্লব দেখে আতঙ্ক। যাতে বিপ্লবের ঢেউ এদেশেও না আসে।

সম্রাট নিকোলাস ছিলেন আত্মম্ভরি স্বভাবের, নাটকীয় ঘটনা বড় ভালবাসতেন। তিনি অল্প হেসে শেষ নির্দেশ জানালেন, শহরের মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে বন্দীদের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হবে—এবং শাস্তির সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যেন ওরা ভাবে যে সত্যিই একটু পরে মৃত্যু। বন্দীরা শেষ পর্যন্ত যখন মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবে—ঠিক তখন তাদের জানিয়ে দিও যে, সম্রাট তাঁর অশেষ দয়ায় বন্দীদের জীবন উপহার দিয়েছেন।

আরম্ভ হল চূড়ান্ত হাস্যকর করুণতম নাটক।

২২শে ডিসেম্বর সকালবেলা ডস্টয়েভস্কি ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, কারাগারে কি রকম যেন সাড়া পড়ে গেছে। একটু বাদে তাঁদের ঘোড়ার গাড়ি করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো, দু' পাশে উন্মুক্ত তরবারি হাতে রক্ষী! অন্তহীন যাত্রা (তিন চার মাইল) এক সময় শেষ হল, বরফ বিছানো একটি পার্কে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন। এই পার্ক তাঁর খুব চেনা—তবু অন্যরকম দেখাচ্ছে। এত ভোরে প্রচুর জনতা, অগণিত সৈন্য, মাঝখানে তিনটে দণ্ডওয়ালা একটি উঁচু কাঠের মঞ্চ, কালো কাপড়ে মোড়া। পর পর আরও গাড়িতে করে বন্দীরা এলো, অনেকদিন পর ডস্টয়েভস্কি অন্য বন্দীদের দেখতে পেলেন—তাদের সঙ্গে করমর্দন করে একটু খোসগল্প আরম্ভ করবেন—এমন সময় সেনাপতি মহাশয় এসে সকলকে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার পর এলো এক কবরের পোশাক পরা পুরোহিত, সে সকলকে নিয়ে গেল বধ্য মঞ্চে—এবার দু লাইনে সকলকে দাঁড় করানো হল। সকলেই এবার ঘটনাটা বুঝতে পেরেছে—অনেকের মুখ বিবর্ণ, কেউ কেউ আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো—দু' একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে—আবার তাদের তুলে দেওয়া হল। কথা বলা বারণ, তাই ডস্টয়েভস্কি ফিস্‌ফিস্ করে পাশের লোকটিকে তিনি জেলে বসে শেষ যে-গল্পটি ভেবেছিলেন—তার প্লট শোনাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি মরে গেলে গল্পটা আর কারুকে পড়ানো যাবে না এই ভেবে একটু খারাপ লাগলো। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতই হয়তো তাঁকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল।

একজন কেরানী এসে নাম ধরে ধরে শাস্তি উচ্চারণ করে গেল।

ডস্টয়েভস্কি কান পেতে শুনতে লাগলেন, বারবার একই কথা ঠিক যেন গানের ধুয়োর মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ শুনলেন, "ফিয়োডোর মিখাইলোভিচ্ ডস্টয়েভস্কি—মৃত্যুদণ্ড, গুলি করিয়া হত্যা"—এ যেন অপরিচিত কারুর নাম, তাঁর নয়। গায়ে পাতলা জামা, শীতে কাঁপুনি আসছিল—এমন সময় হঠাৎ রোদ উঠতে এমন আরাম লাগলো যে ডস্টয়েভস্কি তাঁর পাশের লোকটিকে বললেন, আমরা সত্যিই কি আর মরব! তাঁর সঙ্গী ইসারায় একটি ঢাকা গাড়ি দেখালেন—যার মধ্যে তাঁদের কফিনগুলো আনা হয়েছে।

কেরানীর পর এলো পাদ্রী, "পাপের বেতন মৃত্যু" উচ্চারণ করলো, তারপর নাতিদীর্ঘ উপদেশ। অনেকের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কিও ক্রশের গায় চুম্বন করলেন। তাঁর 'দি ইডিয়ট' উপন্যাসে ঠিক এ-রকম একটি দৃশ্য আছে—যেখানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ছুটে গিয়ে লোভীর মত ক্রশের গায়ে ওষ্ঠ চেপে ধরেছিল—যেন এটা তার বিষম প্রয়োজনীয়। চুম্বন করার পরই সে অনুভব করলো—সে সমস্ত মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে গেল, সে অসহায়, একা!

হঠাৎ সেনাপতি এসে পাদ্রীকে গম্ভীরভাবে সরে যেতে বললেন। এর পর দু'জন সৈনিক এসে বন্দীদের মাথার উপর দু'খানা তরবারি ভেঙে ফেললো—এতে যার যার ব্যক্তিগত মর্যাদার অবসান হল। ডস্টয়েভস্কিও এই অপমানের অনুষ্ঠান সহ্য করার জন্য হাঁটু মুড়ে বসলেন। তারপর দণ্ডিতরা শেষবারের মত প্রসাধন করে নিল সেখানেই। বাইরের জামা খুলে তাঁরা সকলে সাদা লিনেনের ঢোলা পোশাক পরে নিলেন। একজনের রসবোধ তখনো শুকিয়ে যায় নি, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে এই জোব্বাটায় কেমন দেখাচ্ছে?'

হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এলো। রক্ষীরা পেট্রাসভস্কি এবং আর দু'জনকে নিয়ে বেঁধে ফেললো তিনটি দণ্ডের সামনে। সেনাপতির হুকুমে পনেরোজন সৈনিক রাইফেল তুলে দাঁড়ালো। ডস্টয়েভস্কি সামনের দিকেই দাঁড়িয়েছিলেন পাঁচজনের পর—এর পরের বার তাঁদের তিনজনের পালা। এত শীঘ্র মৃত্যু!

'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টে' রাসকলনিকভ ভেবেছিলেন, মৃত্যুর ঠিক একঘণ্টা আগে কোন দণ্ডিত আসামী ভাবতে পারে বা বলতে চায়, যদি তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় কোন উঁচু জায়গায়, কোন পাহাড়ে, শুধু দাঁড়াবার জায়গা আছে এমন কোন খাদের কিনারে, তার চতুর্দিকে বিপদ, সমুদ্র, অসীম অন্ধকার, অনন্ত নির্জনতা, অবিরাম ঝড়—যদি তাকে এক গজ জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সারাজীবন, এক সহস্র বৎসর, অনন্তকাল—তবুও এই মুহূর্তে মৃত্যুর চেয়ে তা ভালো। শুধু বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকা আর বেঁচে থাকা।

'দি ইডিয়ট' উপন্যাসেও দণ্ডিত আসামী মৃত্যুর ঠিক দু'মিনিট আগে ভেবেছিল—ঠিক এখন যদি তাকে জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে জীবন নিয়ে সে কি করবে, সম্মুখে বিস্তৃত অনন্তকাল নিয়ে কি করবে সে? এই চিন্তা তাকে এত উত্তেজিত করে তোলে যে, সে ভাবে তাকে যেন এখুনি গুলি করে মারা হয়।

এগুলি ডস্টয়েভস্কির নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। শেষ মুহূর্তে তিনি উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। মরতে দুঃখ ছিল না। চার-পাশের সব কিছুই যেন অকিঞ্চিৎকর। পাশে দাঁড়ানো দুজনকে আলিঙ্গন করলেন। সেই উষ্ণ স্পর্শ এক মুহূর্তের জন্য ভালো লাগলো।

রেডি। লক্ষ্য ঠিক কর। সেনাপতির গর্জন শোনা গেল। পনেরটি বন্দুক তিনজন মানুষের দিকে মুখ ফেরালো। এমন সময় একটি ড্রামের শব্দ শোনা গেল দূর থেকে। দ্রুত ঘোড়ারগাড়ি থেকে নেমে, একজন অফিসার সম্রাটের দয়ার হুকুম পড়লেন। বন্দুকের মুখ উপরে উঠে গেল, তিনজনের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। নাটক শেষ।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যেই হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা গেল, দু'জন তৎক্ষণাৎ হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন, একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'সম্রাট জার দীর্ঘজীবী হোন'। একজন তিক্ত কণ্ঠে বললো, 'এর চেয়ে আমি মরতেই চেয়েছিলাম'! ডস্টয়েভস্কির মধ্যে আনন্দ বা দুঃখ কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। তাঁর মধ্যে তখনো সেই ভয়ঙ্কর উদাসীনতা।

সম্রাটের জন্মদিনে তাঁদের হাত পায়ে লোহার শিকল পরানো হল। শিকলের ওজন দশ পাউণ্ড, হাঁটতে চলতে পারা যায় না। সেই অবস্থায় তাঁদের পাঠানো হল সাইবেরিয়ায়। ওমস্ক শহরের কারাগারে বন্দী রইলেন চার বছর। নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মাথার একদিক কামিয়ে দেওয়া হল, অন্ধকার ঘরে একটা কাঠের তক্তা তাঁর শয্যা। সাইবেরিয়ায় বন্দীনিবাসের নিষ্ঠুরতা বর্ণনার অতীত। আত্মশুদ্ধির জন্য ডস্টয়েভস্কি যে নির্যাতন এবং যন্ত্রণা ভোগের কথা বর্ণনা করেছেন—তাঁর নিজের কষ্টভোগ বোধহয় তার চেয়েও বেশী। সেই কারাগারের অন্য বন্দীরা বেশীরভাগই ছিল খুনে গুণ্ডা-বদমাস। তারা ভদ্রলোক বলে ডস্টয়েভস্কিকে ঘৃণা করতো। কর্তৃপক্ষও বেশী অত্যাচার করতো ভদ্রলোক কয়েদীদের উপর। এই সময় থেকেই ডস্টয়েভস্কির মৃগীরোগ ভয়ানক বেড়ে যায়—একবার জেলখানায় চাবুক খেয়েছিলেন এজন্য। জেলখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে যে বই লিখেছিলেন পরে, তার নাম দিয়েছিলেন 'দি হাউস অব দি ডেড'।

চার বছর কারাজীবনের পর সৈনিক জীবন—তাও কম ঘৃণিত এবং কষ্টকর নয়। সাধারণ সৈনিক থেকে কিছুদিন পর তাঁকে লেফটেনান্ট করা হয়েছিল। আড়াই বছর সৈনিক থাকার পর আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর করিয়ে মুক্তি পান। ঐ সময়ই ডস্টয়েভস্কির প্রথম প্রেম এবং বিবাহ।

এক মাতাল অফিসারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ক্রমে হৃদ্যতা হয় তার পরিবারের সঙ্গে। ডস্টয়েভস্কি স্বভাবতই ছিলেন নিঃসঙ্গ। সৈনিক জীবনে তাঁর বন্ধু ছিলেন এক তরুণ আইনজীবি—যে তাঁকে বহু সাহায্য করেছে—আর এখন এই মাতাল অফিসারের স্ত্রী। মহিলার নাম মারিয়া ডিমিট্রিয়েভ্না—দীর্ঘ কৃশ চেহারা, প্রায় রূপসী, বয়স তিরিশ। একটি বাচ্চা ছেলে আছে। কিছুদিন পর মাতাল স্বামীর মৃত্যুর পর মারিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়ে। ডস্টয়েভস্কি পাগলের মত ভালবেসেছিলেন মারিয়াকে, তাঁর আর্থিক সামর্থ্য কিছুই নেই—তবুও মারিয়াকে বিয়ে করতে চাইলেন! মারিয়াও ভালবাসতেন তাঁকে কিন্তু কিছুতেই বিয়েতে রাজী হতে চাননি। একটি তরুণ স্কুল-মাস্টারকে স্বামী হিসেবে ঠিক করেছিলেন—কিন্তু ডস্টয়েভস্কি প্রচুর কান্নাকাটি এবং বাক-যুদ্ধের পর বিবাহে সক্ষম হন। মারিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সুখের হয়নি—কিছুদিন পর মৃত্যু হয় মারিয়ার—রেখে গেলেন সেই শিশু পুত্রটি—সে সারা জীবন ডস্টয়েভস্কির কপালে কুগ্রহ হয়ে ছিল।

এশিয়া এবং ইউরোপের সীমান্ত পেরিয়ে ডস্টয়েভস্কি আবার ফিরে এলেন রাশিয়ায়। সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর বেশী দিন লাগেনি, লেখা ছাপাবার অনুমতি আদায় করতে যেটুকু দেরী হয়েছিল। ফিরে এসে তিনি বিপ্লবীদের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করলেন। ফিরে এসে তিনি অন্যান্য লেখার সঙ্গে আরম্ভ করলেন, 'দি ইনসাল্টেড অ্যাণ্ড ইনজিওরড।' তারপর জেলখানার জলন্ত স্মৃতি, 'দি হাউস অব দি ডেড'।

পোলিনা নামে একটি মেয়ে দু' একটি গল্প লিখেছিল ডস্টয়েভস্কির ভাই-এর পত্রিকায়—টগবগে, তেজী রূপসী সেই মেয়েটি ডস্টয়েভস্কির সংস্পর্শে এলো এবং মেয়েটি তাঁর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করলো সেই বিখ্যাত লেখকের কাছ থেকে। সে ছিল বেপরোয়া, কোনো নিয়মনীতি মানতো না—ডস্টয়েভস্কি তার সঙ্গে বিদেশে চলে গেলেন, দিন কাটাতে লাগলেন এক হোটেলে।—তারপর কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি স্বাস্থ্যবান ছেলের সঙ্গে মেয়েটি চলে যায়।

এরপর থেকে ডস্টয়েভস্কির জীবন প্রায় একই রকম। একই রকম

যন্ত্রণাময়। মাঝে মাঝে এপিলেপ্‌সির আক্রমণ, প্রচণ্ড অর্থাভাব, পাওনাদারের তাড়া, প্রকাশকদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ নেওয়া, আবার জুয়া, আবার অভাব, আবার অর্থভিক্ষা! প্রকাশকদের তাড়নায় মাঝে মাঝে খুবই অনিয়মিতভাবে সাহিত্যের এক একটি অবিনশ্বর কীর্তিগ্রন্থ লিখে দেওয়া। অর্থাভাব একটুও দূর হল না। টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি এবং টুর্গেনিভ—এই তিনজনকে বলা হতে লাগলো রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক—তিনজনের কেউ কারো বন্ধু নন—ডস্টয়েভস্কি ওদের দু'জনকে সহ্য করতে পারতেন না—মূলত ওদের বিপুল অর্থের জন্য। ইতিমধ্যে তিনি তাড়াতাড়ি লেখার জন্য একটি মেয়েকে স্টেনোগ্রাফার রেখেছিলেন—এবং কিছুদিনের মধ্যে তাকে বিয়ে করে নেন—এবং দ্বিতীয় স্ত্রী আনা, যেমন রূপসী তেমন ধীমতী, যিনি আজীবন ডস্টয়েভস্কিকে সামলেছেন বলা যায়।

অত্যন্ত অভাব অভিযোগের মধ্যে হয়তো প্রকাশকের কাছ থেকে বা নিজের ভায়ের কাছ থেকে কিছু অর্থ পেলেন। সেই অর্থ তৎক্ষণাৎ বাড়িয়ে ফেলবার দুর্মর বাসনায় তিনি চলে যেতেন জুয়ার আড্ডায়। এবং চমৎকার ভাবে ডানা মেলে টাকাগুলো উড়ে যেত অন্যের পকেটে। আবার ফিরে এলেন স্ত্রী-কন্যার কাছে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

অত দুর্যোগের মধ্যেও লেখা পছন্দ না হলে কিছুতেই ছাপতে দিতেন না। পাওনাদার, প্রকাশকরা ছিঁড়ে খাচ্ছে—তবুও তিনি প্রায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের কপি পছন্দ হয়নি বলে নষ্ট করে ফেলেছেন। প্রকাশককে ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানিয়েছিলেন—তাকে অপেক্ষা করতে হবে—নইলে তার দেওয়া অগ্রিম টাকা সে ফেরৎ নিতে পারে!—কিন্তু ফেরৎ দেবার কথা দূরে থাক—তাঁর নিজের এবং শিশুকন্যা ও স্ত্রীর খাবার মত একটি পয়সাও নেই—বরং আরও অগ্রিম চাই!—একবার জুয়াখেলায় সর্বস্ব হেরে—হোটেলে বাঁধা পড়ে আছেন। নিজের কোট-প্যান্ট এমন কি আণ্ডার ওয়্যার এবং স্ত্রীর গাউন পর্যন্ত বন্ধকী দোকানে, উপন্যাসের খানিকটা পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত তৈরি আছে, কিন্তু পাঠাবার মত ডাক টিকিটের পয়সা নেই। তখন তিনি দেশবরেণ্য লেখক।

ষাট বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। প্রায় শেষ দু'এক বছরে, বিশেষতঃ 'ব্রাদারস কারামাঝোভ' যখন প্রকাশিত হতে শুরু হয় তখন দেশের কাছ থেকে কিছু সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বামীর বইগুলি নিজে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে কিছু অর্থ সাফল্য লাভ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রবক্তার সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। অনেকে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের কথা তাঁর কাছে

জানিয়ে সান্ত্বনা চাইতো।

হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে তাঁর। সেই অবস্থায় তিনদিন ছিলেন। মৃত্যুর কিছু আগে বাইবেলের যে কোন পাতা খুলে স্ত্রীকে পড়তে বললেন! আনা খুলেই উপরের লাইন পড়লেন "Do thou not obtain me"—একটু শুনে ডস্টয়েভস্কি লাইনটা একবার আবৃত্তি করলেন—তারপর বললেন, 'তার মানে আমাকে মরতে হবে।' একথা বলে নিজেই স্ত্রী-পুত্র কণ্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

জীবিত অবস্থাতেই ডস্টয়েভস্কির বই অনুবাদ হতে শুরু হয়েছিল। তাঁর বই খুবই জনপ্রিয় হয় জার্মানিতে। টমাস মান তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। ক্রমে এই নিষ্ঠুর প্রতিভাবানের কীর্তি ছড়ালো ফ্রান্সে এবং ইংরেজী ভাষার জগতে। কেউ কেউ তাঁকে বললেন ইওরোপের ধ্বংসের প্রবক্তা। সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় কিছুদিন তাঁর প্রচার বিঘ্নিত করা হয়েছিল। গোর্কি কিছুতেই পছন্দ করেননি তাঁকে, বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ে আপত্তি করেছিলেন। এখন রাশিয়ায় তাঁর সম্পর্কে মিশ্র মতামত। বাকি পৃথিবীতে তিনি সমস্ত লেখকদের কাছে 'প্রতিভার বিপুল বিস্ময়'।

'পত্র পত্রিকায় আমাকে নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছে, সাধারণ লোকের কথার বিষয়বস্তু এখন আমি, হাউস অব লর্ডসে আমি ঢুকলে এখন আমাকে নিয়ে ফিস্‌ফিসানি ওঠে, রাস্তায় আমাকে অপমান করা হয়, আমি থিয়েটারে পর্যন্ত যেতে ভয় পাই।......

......জনতার গুজব বা ব্যক্তিগত ঈর্ষা আমাকে সমস্ত রকম নারকীয় পাপ কাজ সম্পর্কে অভিযুক্ত করেছে· আমি বলতে চাই আমার সম্বন্ধে যা কিছু ফিস্‌ফিস্ বা গুনগুন বা অর্ধোচ্চারিত হয়েছে তা যদি সত্যি হয় তবে আমি ইংল্যাণ্ডের উপযুক্ত নই—আর যদি মিথ্যে হয় তবে ইংল্যাণ্ড আমার উপযুক্ত নয়!'

বড় ভয়ংকর প্রস্তাব দিয়েছিলেন বায়রণ। সত্য যেদিকেই থাক তাঁর একমাত্র উপায় ইংল্যাণ্ড ত্যাগ। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তিনি অনুপযুক্ত হলে তো কথাই নেই—আর যদি ইংল্যাণ্ড তাঁর মত লোকের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়, তাঁর পরিমাপের মত না হয়, তাঁর মানসিকতার পক্ষে ছোট হয়ে যায়—তবে আর তাঁর সেখানে থাকা চলে না। তাই আজন্ম সুহৃদ ইংল্যাণ্ড। তাঁর অনেক চোখের জল এবং তপ্ত হৃৎস্পন্দনের সাক্ষী! তখন আঠারোশো ষোল সাল, বায়রণ তখন মধ্যযৌবনে, সমস্ত ইওরোপ তাঁর খ্যাতিদীপ্ত মুখচ্ছবিতে ঝলসে যাচ্ছে।

আদালতে বা রাজদরবারে বায়রণের কখনো বিচার হয়নি। কিন্তু জনতার নিষ্ঠুরতম বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। বারবার বাধা দিয়েছে বিপুল প্রতিপক্ষ। বিষম চাপা দুঃখে তিনি বলেছিলেন, "I was accused of every monstrous vice by public rumour and private rancour." হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে অভিযুক্ত হয়ে যেতে হতো আদালতে—তার আগেই তিনি বরণ করেছিলেন স্বেচ্ছা নির্বাসন। জনতার আক্রমণে জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড থেকে প্রস্থান বা পলায়ন তাঁর বুকে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার—কিন্তু সেই উপলক্ষেই ঘোঁট পাকিয়েছিল তাঁর দেশবাসী। এমনই অভিজাত এবং অভিমানী ছিলেন বায়রণ যে, জনতার অভিযোগের উত্তর দেওয়ার বদলে

নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। ভেবেছিলেন, জনমানস সুস্থির হলে, কবি হিসেবে আবার তাঁকে আহ্বান করলে ফিরে আসবেন। কিন্তু আর ফেরা হয়নি।

বেঁচে থাকতে থাকতেই ওরকম বিপুল খ্যাতি এবং অখ্যাতি, বায়রণের মতো আর কেউ কখনো পায়নি। কবি হিসেবে বায়রণের চরিত্র দ্বিতীয় দলের—অর্থাৎ একদল কবি থাকেন শান্ত, আত্মনিমগ্ন, কখনো বা রুগ্ন; হৃদয়ের যত আবেগ ও উত্তাপ কাব্যে খরচ করে নিজের জীবন সিদ্ধকরা জলের মত স্বাদহীন, সেইসব কবি প্রকৃত শহীদের মত। আরেক দল ভয়ংকর, প্রচণ্ড, বলগা ছেঁড়া, উল্কার মত নিজের জীবন ও সাহিত্যকে জ্বালিয়ে দিয়ে যান। তাঁদের শরীরের শিরা, উপশিরা যেন ধনুকের ছিলার মত টান করা। যে কোনো সময় ছিঁড়ে যায়, শেষ হয়ে যায়।

উচ্চতায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, দেবদুর্লভ মুখকান্তি, ডান পা সামান্য খোঁড়া। ঐ খোঁড়া পা বায়রণের জীবনে অতি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে। বস্তুত, তাঁর উচ্চকিত জীবন, রমণীদের সঙ্গে তাঁর অস্বাভাবিক বিলাস—এর জন্য অনেকটা দায়ী তাঁর ঐ খঞ্জ দক্ষিণ পদ। বায়রণের মুখের রঙ ছিল অদ্ভুত রকমের বিবর্ণ। তাঁর সমসাময়িক এক বিখ্যাত লেখক বলেছেন—বায়রণের মুখে একটা অলৌকিকত্বের ছাপ ছিল—ঈশ্বর বা শয়তান—যে ধরনেরই হোক না কেন! কখন তিনি কি কাজ করবেন বা কি কথা লিখবেন তা কিচ্ছু বোঝা যেত না তাঁর মুখ দেখে। ওয়াল্টার স্কট বায়রণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, সে যেন একটা স্কুলের ছেলের মত, যার দু পকেটে সব সময় হাত-বোমা ভর্তি থাকে।

পুরো নাম জর্জ গর্ডন বায়রণ ষষ্ঠ ব্যারণ। জন্ম ১৭৮৮ সালের ২২শে জানুয়ারী—লণ্ডন শহরে। বাপ মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন খেতাবের বোঝা, মান্ধাতা আমলের একটা ভাঙা-চোরা দুর্গের মত বিশাল প্রাসাদ, আর শূন্য-গর্ভ আভিজাত্য। অতবড় বিরাট পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও অর্থকষ্টে ভুগতে হয়েছে অনেক সময়। পারিবারিক স্নেহ বা সুস্থ আবহাওয়া তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর বাবাকে বলা হত ম্যাড জ্যাক বায়রণ। দুবার বিবাহ করেছিলেন তাঁর বাবা। প্রথম পক্ষে একটি মেয়ে হয়েছিল—তার নাম আগস্টা—এই মেয়েটি পরবর্তী জীবনে তার বিখ্যাত কবি ভ্রাতার জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনার জন্য দায়ী হয়েছিল। বায়রণের বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন ক্যাথরিন গর্ডনকে এবং বায়রণের অতি শিশু বয়সেই তাঁর বাবা ঋণের দায়ে ফরাসী দেশে পালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর

মৃত্যু হয়েছিল। বায়রণের মা-ও ছিলেন পাগলাটে ধরনের। মায়ের মৃত্যুর পরই বায়রণ অনুভব করতে পেরেছিলেন মায়ের প্রতি তাঁর কতখানি ভালবাসা এবং আকর্ষণ ছিল। ছেলেবেলায় বায়রণের ভার দিয়েছিলেন এক হাতুড়ে ডাক্তারের উপর—সেই লোকটি বালকের দুর্বল ডান পা-খানা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সারা জীবনের মত সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছিল। এই বিকৃত পা-খানা লুকোবার চেষ্টা করেছেন সর্বক্ষণ লর্ড বায়রণ। লোকের সামনে কখনও হাঁটতে চাইতেন না। তিনি যে অন্য লোকদের চেয়ে সব বিষয়েই অধিক সক্ষম এটাই প্রমাণ করতে তাঁর কেটে গেল সারাজীবন।

হ্যারোতে যখন পড়তেন তখন পড়াশুনোয় খুব চৌকোশ না হলেও খেলাধুলোয় খুব সুনাম ছিল। খোঁড়া পা নিয়েও ক্রিকেট খেলায় ছিলেন খুব পারদর্শী সেই ক্রিকেটের আদিযুগে, সাঁতারে ছিলেন বিখ্যাত। বস্তুতঃ সামান্য খুঁড়িয়ে চলার জন্য যে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাতো তা তিনি জানতেন না। মেয়েদের প্রতি এক উন্মাদ নেশা ছিল তাঁর সারাজীবন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ডন জুয়ানে'র নায়ক ছিলেন তিনি নিজেই। মেয়েদের প্রতি কৌতূহল এবং রহস্য তাঁকে টানতো সর্বক্ষণ। হয়তো মেয়েদের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল না তাঁর কখনও, অন্তত প্রথম যৌবনের পর কোনো দুর্দমনীয় ক্রোধ এবং হীনমন্যতা থেকেই রমণীরূপের তস্কর বৃত্তি জেগে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ভ্রমণ হল আমার জীবন থেকে আত্মরক্ষার উপায়। একটি মেয়ে আমাকে দুঃখ দেয়, আমার উপর অত্যাচার করে—এবং সুতরাং যতক্ষণ না আর একটি মেয়ে আমার ক্ষত সারিয়ে দেয়, আমাকে…' সুতরাং এইভাবে বৃত্ত চলতে থাকে। একজন আঘাত দিলে আরেকজনের কাছে সান্ত্বনার জন্য যেতে হয়—সে আঘাত দিলে আরেকজনের কাছে। সত্যিকারের ভালবাসা এক অর্থহীন কথা—এত বড় কথা রোমান্টিক বায়রণকে বলতে হয়েছে, "উন্মত্ত ভালবাসা, আমার মতে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অসুখ"। শেষ পর্যন্ত প্রেমিক হিসাবে বায়রণের সুনাম বা দুর্নাম যখন রটে গেল প্রচণ্ডভাবে—তখন আর বায়রণের প্রত্যাখান বা ক্লান্তির উপায় রইলো না। আর্তকণ্ঠে বায়রণ একবার বলে উঠেছিলেন, 'আমি কি করবো, মেয়েরা আমার কাছে নষ্ট হতে আসে।'

কাব্য প্রতিভা প্রকাশিত হবার অনেক আগে অতি শৈশবেই বায়রণের প্রেমিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়। প্রথম প্রেমে পতন আট-দশ বছর বয়সে, মেরি ডাফ নামে তাঁরই এক আত্মীয়ার প্রতি। মেয়েটির জন্য প্রায় পাগল হয়ে

উঠেছিলেন, পরে বহুদিন তাঁর মা এই নিয়ে ঠাট্টা করেছেন বায়রণকে। 'জানিস আজ মেরির বিয়ে হয়ে গেল'—যেদিন একথা বলেছিলেন তাঁর মা—বায়রণ সেই দিনটি সারাক্ষণ শোকার্ত ছিলেন।

ষোল বছর বয়সে প্রথম উন্মত্ত ভালবাসায় (বায়রণের ভাষায় নিকৃষ্টতম অসুখে) পড়েছিলেন। মেয়েটির নাম মেরি সাওয়ার্থ। গ্রামে ছুটি কাটাতে গিয়ে এই অভিজাত পরিবারের মেয়েটির প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন বায়রণ। অসাধারণ রূপসী ছিলেন মেরি—বায়রণ সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত জুড়ে রইলেন। 'তার শরীর রামধনু দিয়ে তৈরী, সমুদ্রের ঢেউ-এর মত তার চুল'—এসব কথা শুনলে অভিভূত হবে না এমন মেয়ে খুব কম। কিন্তু মেরির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল—এক লম্বা চওড়া যুবক, মারামারি এবং তলোয়ার খেলায় ধুরন্ধর—যাকে বলা যায় ভিলেজ হীরো,—সে ছিল মেরির হবু বর। বায়রণের ব্যবহার তার মোটেই পছন্দ হল না, একদিন বেশ গরম গরম কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।' যুবকটি সোজা ছুটে এসে মেরিকে জিজ্ঞাসা করলো,—'তুমি আমাদের এনগেজমেন্টের কথা এখুনি ঘোষণা করবে কিনা বলো!' মেরি রাজী হয়ে গেল।—এই ঘটনার আর একটি করুণ অংশ আছে—বায়রণ যাতে ভয়ংকরভাবে আহত হয়েছিলেন। একদিন বায়রণ শুনতে পেলেন—পাশের ঘরে মেরি তার দাসীকে বলছে, 'তুই পাগল হয়েছিস্! আমি ঐ খোঁড়াটাকে বিয়ে করব নাকি?' অপমানে সর্বাঙ্গ পুড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ বায়রণ সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে গোটা গ্রাম পার হয়ে পালিয়ে গেলেন।'

কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে পড়বার সময় প্রথম চটি কবিতার বই বার হলো বায়রণের। ধর্মধ্বজদের আপত্তি উঠলো সেই কবিতা সম্পর্কে—তিনি স্বেচ্ছায় সেই বইয়ের সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেললেন। ১৮০৮ সালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন এবং হাউস অব লর্ডসে তাঁর প্রথম বক্তৃতা এমন তীক্ষ্ণধী এবং ঝকঝকে হয়েছিল যে, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদেরাও উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল শ্রমিকদের দুর্দশা। ততদিনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। অভিজাত বংশের রূপবান যুবক, বুদ্ধির প্রভায় আলোকিত, অমন তীব্র আবেগের কবিতা লিখেছেন—সমস্ত ইংল্যাণ্ডের চোখ পড়লো তাঁর দিকে। ১৮১৩ সালে বের হলো 'চাইল্ড হেরল্ডস পিলগ্রিমেজ'। চতুর্দিক থেকে উত্থিত হল সরব প্রশংসা। বায়রণের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে মেকলে লিখেছিলেন, 'এক চমৎকার সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং দেখলাম আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি।'

সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবার পরই বায়রণ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভ্রমণে। ভারতবর্ষেও আসার ইচ্ছে ছিল তাঁর —শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। সেই সময় থেকে আরম্ভ হল উদ্দাম জীবনযাত্রা —মদ্যপাত্রে এবং রমণীর বুকে ডুবে থাকা। ঐগুলি ছিল তাঁর কবিত্বের খাদ্য। আহার ছাড়া যেমন মানুষের শরীর টেঁকে না,—তেমনি কিছু কিছু নিয়মহীন উপাদান ছাড়া অনেক কবির কবিত্ব টেঁকে না। কারণ, এইসময় তিনি Childe Herold-এর রচনা শুরু করেন। মেয়েরা চুম্বকের মত টানতো বায়রণকে। প্রতিভা যে এক ধরনের পাগলামি, কবিত্ব যে এক মারাত্মক অসুখ এ বিষয়ে বায়রণের কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, কবিতার প্রতি বেশী আকর্ষণ হলো অসুস্থ শরীরে যন্ত্রণা-দগ্ধ মনের ফল। রোগ বা শারীরিক বিকৃতি আমাদের কালের সব শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গী। কলিন্স 'উন্মাদ, চ্যাটারটন—আমার মনে হয়, উন্মাদ, কাউপার উন্মাদ, পোপ বিকৃত, মিল্টন অন্ধ এবং আরো অনেকে, অনেক'—বায়রণকেও তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ' !

এই সময় মাকে লেখা বায়রণের একটি চিঠি, 'আমরা দুটি কুমারী স্প্যানিশ মহিলার বাড়িতে উঠেছিলাম। বড় মেয়েটি তোমার যোগ্যপুত্রের প্রতি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করেছে, বিদায়ের সময় তাকে গভীর কোমলতার সঙ্গে আলিঙ্গন করেছে। তার কাছ থেকে সে একগুচ্ছ ফুল উপহার নিয়ে এবং নিজের মাথার তিন ফুট দীর্ঘ চুল তাকে উপহার দিয়েছে। সেই উপহার আমি তোমার কাছে পাঠালুম, মা, আমার অনুরোধ আমি ফিরে আসা পর্যন্ত যত্ন করে রেখে দিও। সে আমার শয়নগৃহের অংশ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার ধর্মবোধ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

বহু রমণীর সঙ্গে জীবন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বায়রণের। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্যারোলিন—যিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের একদা প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্নের পুত্র উইলিয়াম ল্যামের (পরবর্তী জীবনে লর্ড মেলবোর্ণ) স্ত্রী। অসাধারণ পুরুষ ছিলেন উইলিয়াম, বিলাসী, কবি স্বভাবের, স্বপ্নময়। স্ত্রীকে তিনি দেখতেন শিশুর মতন, স্ত্রীর ঐসব কুকীর্তিকে তিনি মনে করতেন ছেলেমানুষী খেলা। বায়রণকে দেখার আগেই তাঁর কবিতা পড়ে এবং তাঁর সম্বন্ধে রোমান্টিক গল্প শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্যারোলিন। বায়রণের বন্ধু স্যামুয়েল রজার্স 'চাইল্ড হেরল্ডে'র কিছু অংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন ক্যারোলিন ল্যামকে—তাই শুনে ক্যারোলিন মুগ্ধ এবং উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সারা

শহর ছুটে ছুটে সকলকে এই কবির কবিতার কথা বলতে লাগলেন, এবং রজার্সকে অনুরোধ করলেন, 'আমাকে এখুনি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। ওকে না দেখে আমি মরে যাচ্ছি'। রজার্স উত্তর করলেন, ওর কিন্তু পা খোঁড়া এবং দাঁত দিয়ে নখ কাটে। 'যাই হোক, ওকে যদি ঈশপের মতো কুৎসিত দেখতে হয় তবুও আমি ওকে দেখবোই।' প্রথম দেখার পর বায়রণ সম্বন্ধে ক্যারোলিন ডায়েরীতে লিখেছিলেন, That beautiful pale face is my fate. প্রথম যেদিন আলাপ হল, সেদিন আবেগের আতিশয্যে কথাই বলতে পারেন নি ক্যারোলিন, তারপর একদিন এক পার্টিতে দেখা. একঘর পুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন ক্যারোলিন—বায়রণকে দেখেই ছুটে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুতে লাগলেন। একজন পার্শ্বচর বলে উঠলো, 'দেখো বায়রণ, তুমি কত ভাগ্যবান, লেডি ক্যারোলিন আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন—কিন্তু তোমাকে দেখে, তাঁর মনে হল, তাঁর মুখ যথেষ্ট সুন্দর নেই, প্রসাধন নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আবার ছুটে গেলেন'! সেই পার্টিতে অগণিত সুঠাম যুবক এসেছিল, রূপে গুণে, ঐশ্বর্যে, আভিজাত্যে অনেকেই বায়রণের চেয়ে ছোট ছিল না—কিন্তু তবুও সেই সন্ধ্যায় বায়রণই ছিলেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরুষ! সমস্ত মেয়ের দৃষ্টি তাঁর দিকে। এ দৃশ্য অন্যান্য পুরুষদের বেশীদিন সহ্য করার কথা নয়।

ক্যারোলিনের সঙ্গে বায়রণের প্রেমকাহিনী অত্যন্ত বিখ্যাত এবং বিচিত্র। খুব রূপসী নন, ক্ষীণতনু, পাগলাটে স্বভাবের এই অভিজাত পরিবারের বিবাহিতা রমণীটি বায়রণের মধ্যে কি দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু এমন গভীরভাবে আত্মসমর্পণ কোন মেয়ে আর কখনো করেনি, তার জন্য বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে, তীব্রভাবে অপমানিত হয়েছেন, সমস্ত জীবন কেটেছে এক দীর্ঘ বিলাপের মধ্যে।

বায়রণের সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা না হলে তাঁর মন ছটফট করতো। বায়রণ রোজ সকালবেলা এসে বসতেন তাঁদের বাড়িতে, সকলের সঙ্গে গল্প করতেন, ক্যারোলিনের ছেলেকে আদর করতেন—বেশ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। হঠাৎ একদিন বায়রণ ক্যারোলিনের প্রেমপত্র পেলেন। বায়রণ লণ্ডনে থাকতেন একা বাড়ি ভাড়া করে। খুব একটা বন্ধু-বান্ধব ছিল না। অভিজাত হিসেবে শুধু তাঁর নামের বোঝাটাই ছিল—অর্থ সম্পদ ছিল না তেমন। অভিজাতদের প্রতি তাঁর একটা অকারণ ক্রোধ ছিল—যদিও ওদের বিলাসপ্রিয়তা পছন্দ করতেন। ক্যারোলিনের কাছ থেকে প্রেমের আহ্বান

পেয়ে সাড়া দিতে তিনি দেরী করেন নি। ক্যারোলিন চিঠিও লিখতেন খুব সুন্দর। বায়রণ তাঁকে লিখলেন, 'আমি সবসময় তোমার কথা ভেবেছি—নিপুণিকা, দুর্বোধ্য, সহৃদয়, জটিল, ভয়ংকর, আকর্ষণময় ছোট্ট প্রাণীটি…'। ক্রমে ক্রমে জেগে উঠলো শরীরের আগুন, সমস্ত বিশ্বসংসার ভুলে দুজনে দুজনের শরীর মন নিয়ে ডুবে গেলেন।

অসম্ভব নির্লজ্জতা ছিল ক্যারোলিনের—বায়রণের প্রতি উন্মাদ ভালোবাসা জানাতে তিনি কখনো স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করতেন না। ক্যারোলিনের শয়ন ঘরে, বায়রণের বাড়িতে যে কোন জায়গায় বাদলা পোকার মত ক্যারোলিন ছুটে যেতেন বায়রণের কাছে। সমস্ত পার্টিতে বায়রণের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতেন—এমন কি যে সব পার্টিতে ক্যারোলিনের নেমন্তন্ন থাকতো না—সেখানেও রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁর প্রাণপ্রিয়ের জন্য। বায়রণও অসম্ভবরকমের আবেগময় চিঠি লিখেছেন তাঁকে। 'আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারই, আমি তোমার ইচ্ছার অধীন, তোমাকে মানবো, সম্মান করবো, ভালবাসবো—এবং যেখানে, যখন এবং যে রকমভাবেই হোক তুমি যেতে চাও বা যেতে পারো আমি তোমার সঙ্গে যাবো।…'

অবিলম্বে ক্যারোলিন বেপরোয়া দুঃসাহসিনী হয়ে উঠলেন, নানা অসম্ভব উপায়ে এমন কি ছোকরা চাকরের ছদ্মবেশ ধরে মিলিত হতেন তাঁর দুরন্ত কবির সঙ্গে। এমন কি তাঁর সমস্ত রত্ন-অলঙ্কার দিতেও প্রস্তুত ছিলেন ঐ কবির জন্য।

এতটা ভালবাসা বুঝি বায়রণের সহ্য হয় না। কেন না ক্যারোলিন যেন তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করতে চেয়েছিলেন। কোনো স্ত্রীলোকের উপর সে রকম আকর্ষণ কখনো হয়নি বায়রণের।

উভয়ের প্রকাশ্য প্রেমলীলায় দেশে ঢি-ঢি পড়ে গেল। অভিজাত সমাজের মেয়েদের এসব একটু থাকেই। কিন্তু এমন প্রকাশ্য এবং নির্লজ্জ! একদিন ক্যারোলিনের মা মেয়েকে ডেকে ভর্ৎসনা করছিলেন এমন সময় তাঁর স্বামী এসে কিছু রুক্ষ কথা বললেন! ক্যারোলিন তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমি তাহলে এখুনি চলে যাবো এবং ওর সঙ্গে থাকবো'!—'তাই যাও, উচ্ছন্নে যাও', স্বামী বলে উঠলেন।

ক্যারোলিন জামা-কাপড় না বদলেই তখুনি চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। এ কী রকম কেলেঙ্কারী! তার মা এবং শাশুড়ী তখুনি ছুটে গেলেন বায়রণের কাছে।

বায়রণ বসেছিলেন একা। অতবড় পরিবারের দুই সম্ভ্রান্ত রমণী তাঁর কাছে এসে মিনতি করছেন দেখে বায়রণ অবাক হবার সঙ্গে সঙ্গে মজাও পেলেন প্রচুর। শেষ পর্যন্ত বায়রণের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এক ডাক্তারের বাড়ি থেকে ক্যারোলিনকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হল।

তখন সকলেই চাইলেন ক্যারোলিনকে কিছুদিনের জন্য লণ্ডন থেকে দূরে রাখতে। এমন কি বায়রণকেও। কিন্তু ক্যারোলিন কিছুতেই রাজি না। ক্রমশঃ বায়রণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়ে এলো। বায়রণ অমন প্রেমিকাকে সহ্য করতে পারলেন না আর। শেষ পর্যন্ত বায়রণ তাঁর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত রূঢ় মন্তব্য পর্যন্ত করেছিলেন। ক্যারোলিন শেষবারের মত তাঁকে দেখতে চান। তা আর হল না। উভয়ের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে গেল। বহুদিন পর একবার বায়রণকে দেখে ক্যারোলিন আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

দু' একবার অবশ্য বায়রণের সঙ্গে দেখা হয়েছে ক্যারোলিনের—কিন্তু সে দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো। এ কোন্ কবিকে দেখছেন ক্যারোলিন, মনে পড়লো ১৮১২ সালের সেই স্বপ্নের মতো দিনগুলির কথা, সকালে গোলাপগুচ্ছ হাতে নিয়ে কবি আসতেন তাঁর বাড়িতে—যে কোন পার্টিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরুষ যে লর্ড বায়রণ—সে ছিল তাঁরই প্রিয়তম। তুমি যখন যেভাবে যেখানে যেতে চাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো—বায়রণ তাঁকে লিখেছিলেন। আজ চোখে সেই মেয়ের সন্ধান নেই, আজ বায়রণ তাঁকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বায়রণের সঙ্গে শেষবার দেখা হল লেডি হীথকোটের নাচঘরে। যেমন নাটকীয় তেমনি করুণ সেই শেষ দেখা। হয়তো বায়রণ জানতেন না যে সেই আসরে ক্যারোলিন আসবে।

ক্যারোলিন খুব সুন্দর নাচতে পারতেন কিন্তু বায়রণ তাঁর ভালোবাসার দিনগুলিতে ক্যারোলিনকে নাচতে বারণ করেছিলেন। ক্যারোলিন তারপর আর কখনো নাচেন নি। বায়রণ নাচ পছন্দ করতেন না—ওয়ালট্জ নাচের বিরুদ্ধে তিনি একটা বই পর্যন্ত লিখেছেন। বায়রণের একটা পা একটু খোঁড়া ছিল সেইজন্য কোন নাচের আসরে তাঁর অংশগ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। নাচের উপর তাই অত রাগ।

লেডী হীথকোটের বাড়ির অনুষ্ঠানে গৃহস্বামিনী ক্যারোলিনকেই অনুরোধ করলেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য। আস্তে আস্তে ক্যারোলিন এসে দাঁড়ালেন বায়রণের সামনে, বিষণ্ণ ভাঙাভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

'আশা করি এখন আর আমার নাচতে কোন বাধা নেই ?'

'—না, নিশ্চয়ই না'। লোহামেশানো গলায় বায়রণ বললেন, 'একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে নাচো। নাচ সকলের চেয়ে তুমি সব সময় ভালো পারতে। আমি বসে বসে দেখে আনন্দ পাবো।'

নাচ আরম্ভ করলেন ক্যারোলিন। ক্রমে নাচের গতি উন্মাদ হয়ে উঠলো—সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে লাগলো তাঁর চোখের সামনে—ঘুরতে লাগলো তাঁর আকাঙ্ক্ষা, যৌবন, প্রেম।

হঠাৎ একসময় হাঁপাতে হাঁপাতে 'ওঃ বায়রণ!' বলে চিৎকার করে ক্যারোলিন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ক্যারোলিন বায়রণের গা ঘেঁষে এসে একটা ছুরির মত জিনিস দেখিয়েছিলেন। কেলেঙ্কারী এড়াবার জন্য বায়রণ তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এখন ক্যারোলিনের কি হল দেখবার জন্য লেডি হীথকোট এসে বায়রণের সঙ্গে পাশের ঘরে দ্রুত গেলেন। টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে শুয়েছিল ক্যারোলিন—তার হাতে একটা ছুরি। লেডি হীথকোট মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন ভয়ে। বায়রণ তখনও নির্মম এবং কঠিন। ক্যারোলিনের ছুরি ধরা হাতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'মারো প্রিয়তমা, মারো, কিন্তু তুমি যদি রোমানদের মতো ব্যবহার করতে চাও—তবে ভেবে দেখো কোনদিকে তোমার ছুরিটা তুলবে। তোমার নিজের বুকের দিকে ছুরিটা তোলো; আমার দিকে নয়, কারণ সেখানে তুমি ইতিমধ্যেই অনেক আঘাত করেছ!'

একটি তীক্ষ্ণ শব্দ করে ক্যারোলিন ছুরি হাতে ছুটে গেলেন দরজার দিকে—লেডি হীথকোট তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দেখলেন ক্যারোলিনের সমস্ত পোশাক রক্তে লাল।

সেই বাড়ির প্রতিটি নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলা এই কাণ্ড দেখেছিলেন। মুহূর্তে এই নাটকীয় কাণ্ড ছড়িয়ে গেল সারা লণ্ডন শহরে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে অসংযত ঠাট্টা বিদ্রূপ বেরুতে লাগল। ক্যারোলিন অবশ্য পরে বলেছিলেন সেদিন ওরকম কিছুই হয়নি—একটা ভাঙা গেলাসে তাঁর হাত কেটে গিয়েছিল মাত্র।

বায়রণের সঙ্গে ক্যারোলিনের সেই শেষ দেখা। ক্যারোলিনের বুকের হাহাকার অবশ্য তখনও বায়রণকে ঘিরে ছিল। একদিন বায়রণ নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন টেবিলের উপর একখানা বই খোলা—তার প্রথম পাতায় ক্যারো-

লিনের হাতের লেখা 'আমাকে মনে রেখো।' টাটকা কালির দাগ তখনো শুকোয়নি। একটু আগেই ক্যারোলিন একা চোরের মত ঢুকে লিখে গেছে। কিন্তু বায়রণের মনে তখন তার জন্য একটু আকর্ষণও নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখায় তলায় কয়েক লাইন কবিতা লিখলেন। সেই লেখার অনেকটা এই রকম, তোমাকে মনে রাখবো? তোমার মত কুলটা এবং বিশ্বাসঘাতিনী মহিলাকে চিরকাল ঘৃণা এবং ধিক্কারে মনে রাখবো!—ক্যারোলিনের পরম সৌভাগ্য যে মৃত্যুর আগে তাকে এই কবিতা দেখতে হয়নি।

এরপর ক্যারোলিন তিনখানা বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে একখানা উপন্যাস 'গ্লেনারভন'—তাঁর আত্মজীবনীর মতই। এই উপন্যাস পড়লে ক্যারোলিন, তাঁর স্বামী উইলিয়াম ল্যাম্ব এবং বায়রণকে স্পষ্ট চেনা যায়। বায়রণের লেখা অনেক চিঠি এর মধ্যে হুবহু ব্যবহার করা ছিল। এই বই পড়ে ক্যারোলিন সম্বন্ধে বায়রণ বলেছিলেন, 'ভগবান ওকে যেন পরবর্তী জগতেও অভিশপ্ত করেন! কারণ ও নিজেই নিজেকে অভিশপ্ত করেছে!' বায়রণের এমন নির্দয়তা কেউ ক্ষমার চোখে দেখে নি।

ক্যারোলিনের সঙ্গে যখন উদ্দাম প্রণয়লীলা চলছিল—সেই সময় ক্যারোলিনদের বাড়িতে আর একটি মেয়ে বায়রণকে দূর থেকে লক্ষ্য করতো। এই কুমারী মেয়েটিও রূপসী, অভিজাত এবং রুচিসম্পন্ন। কিন্তু সে একটু শান্ত, ধীর স্বভাবের, তার নাম ইসাবেলা মিলব্যাঙ্ক। তার উন্মাদ আত্মীয়ার সঙ্গে বায়রণের বিশৃঙ্খল জীবন দেখে তার কষ্ট হতো, হয়তো এখনো নিজেকে শুদ্ধ করে নেবার সময় আছে ওর, তার মনে হত। ক্রমশঃ বায়রণের হৃদয় এই মেয়েটির দিকে আকৃষ্ট হয় এবং দুবার তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।

বায়রণ বিয়ে করেছিলেন অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্ককে। একটি মেয়েও হয়েছিল তাঁর। অ্যান মিলব্যাঙ্ক কখনো সুখী হননি, সুখী হতেও দেননি বায়রণকে। মেয়েকে নিয়ে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন—ঋণের দায়ে বায়রণের প্রাসাদ বিক্রি হয়ে যাবার আগেই বায়রণ একদিন ক্রোধে অন্ধ হয়ে স্ত্রীকে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললেন। তারপর বহু কাতর অনুরোধ করেছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু বায়রণের স্ত্রী বিচ্ছেদ দাবী করেন এবং সারা জীবনের মত কলঙ্ক মাখিয়ে দেন তাঁর শরীরে।

১৮১৩ সালে বায়রণের সৎবোন অগাস্টা দেখা করতে আসেন বায়রণের সঙ্গে। পৃথিবীতে তাঁর এই 'একমাত্র আত্মীয়' সম্পর্কে বায়রণ যথেষ্ট উৎসাহী

ছিলেন। অগাস্টা তখন বিবাহিতা। অদ্ভুত ধরনের মহিলা, কৃশকায়া, দীর্ঘ, অনেকটা পুরুষের মতো। বায়রণের প্রাসাদে অগাস্টার আগমন ঠিক শনিগ্রহের মতন—তারপর থেকেই বায়রণের পতন।

ইতিমধ্যে পর পর কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে বায়রণের। রোমান্টিক হিসাবে ওয়াল্টার স্কটের বিপুল সম্মান চাপা পড়ে গেল তাঁর কাছে। ইংল্যাণ্ডে তখন তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। শেলী এবং কীট্‌স্ নামে দুজন তরুণ কাব্যপ্রয়াসী অপলক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছেন বায়রণকে। তাঁরাও মনে করতেন, বায়রণ তাঁদের চেয়ে অনেক বড় কবি। 'হায় আমিও যদি বায়রণের মত লিখতে পারতাম!'—কীট্‌স্ বলেছিলেন। বায়রণের 'Corsair' নামের বইটি যেদিন প্রকাশিত হয়—সেইদিনই বিক্রি হয়েছিল ১০,০০০ কপি। সেকাল তো দূরের কথা একালেও যে কোন কবিতার বইএর পক্ষে এ তথ্য স্বপ্নের মতো। বায়রণের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ ছিল এই যে, তাঁর কাব্যগ্রন্থের দুঃসাহসিক কাহিনীগুলির নায়ক হিসাবে লোকে কবি বায়রণকেই কল্পনা করে নিত। এবং সেইটাই হল তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের বিদ্বেষের মূল কারণ।

'দি ব্রাইড অব অ্যাবিডস' কাব্যের বিষয় হলো ভাই এবং বোনের ভালবাসার করুণ পরিণতি। 'দি কর্সের' কাব্যের বিষয় গোপন অতীত। 'লারা' কাব্যে আছে গ্রন্থস্বত্বে তস্করতা। অপর ব্যর্থ প্রেমিকেরা দল পাকাতে লাগলো বায়রণের বিরুদ্ধে। তাঁর সৎবোনের সঙ্গে কুৎসিত সম্পর্কের ইঙ্গিত করে গুজব ছড়াতে লাগলো। এই সময় তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন সকলের গোপন চক্রান্তে ইন্ধন জোগালো। চতুর্দিকে নোংরা মন্তব্য এবং অপমান করা হতে লাগলো বায়রণকে।

বায়রণ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর—এবং ভিতরে ভিতরে লাজুক। স্বভাবে বেপরোয়া হলেও, অত্যন্ত উদার এবং অভিমানী। আড়ম্বর উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি পছন্দ করতেন—কিন্তু অনেকটা শিশুর মত পাপবোধহীন ভাবে। যে জনসাধারণ তাঁকে সম্মানের মুকুট পরিয়েছিল আজ তারাই তাঁর গায়ে কাদা ছুঁড়ছে।—এ অপমান সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠলো বায়রণের পক্ষে। এই সময় তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। বিপদের সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে গেল। 'সকলের চোখে আমি স্বামী হিসেবে জঘন্যতম, মানুষ হিসেবে চরম পরিত্যাজ্য এবং খল। আমার স্ত্রী দুঃখিনী দেবদূতী!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বায়রণ বলে উঠলেন।

জনমত প্রবল হয়ে উঠলো, বায়রণের পক্ষে ইংলণ্ডে থাকা অসম্ভব। এর

সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো রাজনৈতিক কারণ। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যখন ফ্রান্সের ঘোরতর যুদ্ধ তখন তিনি ছিলেন নেপোলিয়নের সমর্থক। নেপোলিয়নের পরাজয় এবং পতনের সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। 'অন দি স্টার অব দি লীজন্ অব অনার' লেখার জন্য হৈ-হৈ পড়ে গেল—হুইগরা তবু বরং তাঁকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু তাঁর স্বজাতি অভিজাতেরা ঘোর বিপক্ষে। সমাজনীতি সম্পর্কে বায়রণের ধারণা ছিল অদ্ভুত, তিনি অভিজাততন্ত্র বা জমিদারদের প্রভুত্ব দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না—আবার সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কেও মনেপ্রাণে উৎসাহিত হতে পারেন নি। সব মিলিয়ে এক কবিত্বময় জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে সমস্ত মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল আন্তরিক।

শেষ পর্যন্ত যখন বায়রণের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রাজদরবার পর্যন্ত গড়াবার উপক্রম হল—তখন আহত বায়রণ ঠিক করলেন, লণ্ডন ত্যাগ করবেন। আদালতের কাঠগড়ায় বায়রণকে কখনো দাঁড়াতে হয়নি ঠিকই কিন্তু তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে। এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টা না করে তিনি নিজেই নিজের দণ্ড বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নির্বাসন। অতবড় অভিজাত বংশের সন্তান না হলে অনেক আগেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হতো বিচারকের সম্মুখে। অভিযোগ সত্যি হোক বা মিথ্যে—বিচারকের সামনে দাঁড়ানোই আত্মাভিমানী কবির পক্ষে মৃত্যুতুল্য। এদেশ যদি আমাকে না চায়—আমি ছেড়ে যাবো এই দেশ। যাবার ঠিক আগের দিন একজন লোক তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'মাই লর্ড, আপনি আবার ফিরে আসবেন তো?'

—নিশ্চয়ই! এতে সন্দেহ কি!

—কিন্তু অনেকে বলছে, আপনি আর ফিরবেন না।

—না, নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। যদি আমি না-ও আসি, আমার আত্মা ফিরে আসবে!

বায়রণের আর ফিরে আসা হয়নি। কিংবদন্তী হলেও একথা কম-গুরুত্বপূর্ণ নয় যে যেদিন বায়রণ চলে যান—সেদিন নাকি অভিজাতবংশের শত শত রমণী ঝিয়ের পোশাক পরে ছদ্মবেশে জাহাজঘাটায় বায়রণকে দেখে চোখের জল ফেলতে এসেছিল। সেই বছরেই বায়রণের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'ডন জুয়ান' প্রকাশিত হয়।

ঘুরতে ঘুরতে বায়রণ এলেন জেনিভাতে। সেখানে শেলীর সঙ্গে দেখা হল। শেলীও তখন প্রণয়ঘটিত কারণে প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন জেনিভায়। বায়রণের

জানলাখোলা স্বভাবের জন্যে বন্ধুত্ব হতে দেরী হল না। দু'মাস সেখানে দুই কবি বিশ্রামালাপের মাঝে মাঝে ভ্রমণ, নৌকাবিহারে কাটাতে লাগলেন।

বায়রণ শেলীকে একটি বজরা উপহার দিলেন, সেই বজরার নাম দিয়েছিলেন 'ডন জুয়ান।' কিন্তু শেলী সেটার নাম বদলে রেখেছিলেন 'এরিয়েল'। অদ্ভুত স্বভাব ছিল শেলীর। সাঁতার জানতেন না, অথচ নৌকো চড়তে ভালবাসতেন খুব। একদিন দুজনে নৌকা করে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ খুব ঝড় উঠলো। বায়রণ জামা কাপড় খুলে সাঁতরাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং শেলীকে সাহায্য করতে চাইলেন। শেলী তাঁর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে শান্ত হয়ে বসে রইলেন এবং বললেন, কোনরকম বাঁচবার চেষ্টা না করেই তিনি সমুদ্রের তলদেশে চলে যেতে প্রস্তুত আছেন। এই এরিয়েলে চড়ে বেড়াবার সময়েই একদিন শেলী জলে ডুবে মারা যান। মৃত্যুর পর শেলীকে দেখতে এসেছিলেন বায়রণ। সম্পূর্ণ দেহটি মদে ভিজিয়ে সৈকতভূমিতে দাহ করা হয়। তিনদিন বাদে উদ্ধার করা হয়েছে তাঁকে। জলজন্তুরা তাঁর শরীর ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে। গভীর বিষাদে বায়রণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

তাঁর মনে পড়ল, মাত্র কিছুদিন আগেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তাঁরা একসঙ্গে বসেছিলেন—সেই বৃষ্টিতে বাইরে বেরুনো যায় না, নানা অলৌকিক বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল রহস্য এবং আত্মা নিয়ে। ঠিক করলেন, এই সময়ে তাঁরা রহস্য-কাহিনী রচনা করবেন। কিন্তু শেলী বা বায়রণ কেউই সুবিধা করতে পারলেন না—কিন্তু মিসেস্ শেলী তৈরী করলেন বিখ্যাত ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনী। সেদিন শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বায়রণ লে হাণ্টকে বললেন, 'শেলীর দেহ পুড়ে যাচ্ছে—কিন্তু ওর আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকবে'।

মিলান শহরে এসে বায়রণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তঁধালের। স্তঁধাল সেই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বায়রণকে দেখে ভালো না বাসা অসম্ভব·····একটি পার্টিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন শুনে একশো মাইল দূর থেকে একটি রমণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু বায়রণের মধ্যে তখন উদাসীনতা, আলাপ হবার পর সেদিকে তিনি মনোযোগ দিলেন না। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। সব শেষে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো, 'তোমরা কবিরা সকলেই নির্বোধ, তোমরা কবিরা সবাই!'

প্রবাসেও বায়রণ অনেকগুলি রমণীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন এবং গভীর সম্পর্ক হয়েছিল ইতালীর এক অভিজাত

পরিবারের বিবাহিতা রমণীর সঙ্গে। কুমারীর চেয়ে বিবাহিতা রমণীদের সঙ্গেই বায়রণের প্রেম হয়েছে বেশী।

তুর্কীদের আক্রমণে যখন গ্রীসদেশ বিপর্যস্ত হয়েছিল তখন ছুটে গিয়েছিলেন বায়রণ, সেই দেশের সাহায্যের জন্য। সভ্যতা, শিক্ষা, শিল্পের শিখরে একদা উন্নীত গ্রীসের প্রতি ভালোবাসা আছে পৃথিবীর সব দেশেরই কবি ও শিল্পীদের। বিশেষত বায়রণ ছিলেন অত্যন্ত প্রবলভাবে মানুষের স্বাধীনতার পূজারী। তিনি তাঁর মনোবল এবং অর্থবল দিয়ে গ্রীসকে সম্পূর্ণ সাহায্য করে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে নিজের স্ত্রী কন্যা বোনদের নাম করেছিলেন। এবং জ্ঞান হারাবার আগে বলে উঠেছিলেন, 'কেন আমি একবার দেশে ফিরে গেলাম না। আমি এই পৃথিবীতে আমার প্রিয় অনেক কিছু জিনিস রেখে গেলাম।' বায়রণের মৃত্যু ১৮২৪ সালে।

সত্যিকারের কবির চরিত্র ছিল বায়রণের, কবিত্বের দুঃখ ছিল—'মাই প্যাং স্থাল ফাইণ্ড এ ভয়েস—আমার দুঃখ একদিন কবিতায় ভাষা পাবে'। কিন্তু বড় তাড়াহুড়োর মধ্যে তাঁর জীবন কেটে গেল, কবিতার ভাষা খুঁজে পাবার সময় হল না। আজ কবিত্বের বিচারে বায়রণের আসন স্বল্পজীবী শেলী ও কীটসের নীচে। কিন্তু সমকালের উপর কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বায়রণ! অন্য লোকের কথা দূরে থাক, স্বয়ং গ্যেটে বায়রণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ইংরেজরা যাই বলুক—ইংল্যাণ্ডের যদি সত্যিই কিছু দেখাবার থাকে তবে শেক্সপীয়ারের পরই বায়রণ!'

বায়রণের কবিতার সেই প্রথম দ্যুতি আজ আর নেই, কিন্তু রোমান্টিক কবির মূর্তি হিসেবে, নিঃসঙ্গ এবং রহস্যময় জীবন কাটাবার জন্য বায়রণের নাম চিরকাল উজ্জ্বল।

পল গগ্যাঁ

পল গগ্যাঁর পৃথিবী ছিল সম্পূর্ণ অন্য রঙের। তাঁর আকাশের রঙ লাল, শস্যক্ষেতের রং বেগুনি, গাছের গুঁড়ির রং সবুজ এবং পাতার রং হলদে। সুতরাং তাঁর স্বভাব, বিচার-ব্যবহার, পৃথিবীর প্রতি প্রতিদিনের চেয়ে দেখা, সবই অন্যরকম। অন্য কারুর সঙ্গে মেলেনা। এই পৃথিবীর সমস্তরকম অজর বাস্তবতার বিরুদ্ধে গগ্যাঁ ছিলেন মূর্তিমান প্রতিবাদ।

শিল্পীদের জীবন নিয়ে অনেক কিংবদন্তী শোনা যায়। তাঁদের নিয়ম না মানা অসামাজিক বেপরোয়া চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চিরকালের বিরক্তি, ক্রোধ বা কৌতূহল আছে। প্রতিদিন আমরা সমান ছাঁচে ঢালা মানুষদের দেখি, তারা আজীবন সময়মতো খায়, শোয় ও ঘুমোয়, বংশবৃদ্ধি করে, যেন শোয়ানো বা উত্তুঙ্গ পৃথিবীর হাজার হাজার সিঁড়ি ঠিক সমানভাবে পা ফেলে ফেলে উঠে যায়। মাঝে মাঝে এমন দু'একজন প্রতিভাবান মানুষ আসে যারা সুখ-শান্তি সংসার সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিতে চায়।

বেঁচে থাকা মানুষের বড় প্রিয়, পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী একজন মানুষের নিজের শরীর। দাঁতের যন্ত্রণা হলে অতি বড় দার্শনিকও সব দর্শন ভুলে যায়। তবু মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা নিজের মৃত্যুর প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাবতীয় প্রচলিত সুখ ও তৃপ্তি পদ-দলিত করে চলে যান তাঁরা—উন্মত্তের মত শিল্পবন্দনার নেশায় নিজেকে প্রতি-ফলিত করার বাসনা তাঁদের টেনে নিয়ে যায় অমোঘ ধ্বংসের দিকে। শিল্প বড় ভয়ঙ্কর, বেশী কাছে গেলে ডানা পুড়িয়ে দেবেই।

চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ জীবন কাটিয়েছেন পল গগ্যাঁ এবং ভ্যান গগ্। এঁদের দুজনকে নিয়ে বহু জীবনী, উপন্যাস, গুজব, চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে। পল গগ্যাঁর শেষ জীবন কেটেছে অমানুষিক কষ্টে—অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় জন্মভূমি থেকে শত শত মাইল দূরে নিজেরই স্বদেশবাসীর কাছ থেকে অত্যাচার এবং লাঞ্ছনায়। তাঁর প্রথম জীবন এবং শেষ জীবনের মধ্যে এমনই দুস্তর ব্যবধান যে মনে হয় দু'জন মানুষ। তৃপ্ত প্রেমিক, আদর্শ পিতা, জীবিকায় সিদ্ধকাম্ পল গগ্যাঁ—হঠাৎ মধ্যজীবনে এসে যেন চোখের নতুন পর্দা দিয়ে পৃথিবীকে দেখলেন। তাঁর সমস্ত জীবনধারা বদলে গেল। সেই পল গগ্যাঁ হয়ে উঠলেন উদাসীন, যন্ত্রণাদগ্ধ, সভ্যতা বিরোধী এবং রঙের সম্রাট।

পল গগ্যাঁর জন্ম ১৮৪৮-এর ৭ই জুন প্যারিসে। মায়ের দিক থেকে স্প্যানিশ রক্তের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন—সেই সঙ্গে দুঃসাহসের বীজ। বাবা ফরাসী সাংবাদিক। গগ্যাঁর যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়—দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর প্রতিকূল হওয়ায় সপরিবারে পেরু যাওয়ার পথে। বিধবা জননী সন্তানদের নিয়ে কিছুকাল পেরুতে কাটাবার পর ফিরে এলেন ফ্রান্সে। ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

গগ্যাঁর বাল্যজীবন খুব উল্লেখযোগ্য নয়—কারণ ভবিষ্যতের শিল্পী সেই বালকের মধ্যে সুপ্ত ছিল না। শিল্পী হবার কোনো বাসনা ছিল না তাঁর, কোনো প্রস্তুতি ছিল না। ছুরির বাঁটে কখনো হয়তো সুন্দর কোনো ছবি খোদাই করেছে—কিন্তু সে তো অনেক ছেলেই করে—কিন্তু তারা শিল্পী হয় না। ভবিষ্যতে এ ছেলে কি হবে এ নিয়ে আশঙ্কা ছিল মায়ের, গগ্যাঁরও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শুধু তাঁর শরীরের স্প্যানিশ রক্ত তাঁর মধ্যে গতির নেশা জাগিয়ে তুলতো। "অরলিয়েন্সে থাকার সময় ন'বছর বয়সে আমি বণ্ডি নামের জঙ্গলের দিকে যাত্রা করেছিলুম—পিঠের ওপর একটা লাঠির মাথায় একটা রুমালে খানিকটা বালি বেঁধে নিয়ে। পিঠের ওপর একটা লাঠি এবং তার মাথায় বাঁধা একটা পুঁটুলি—ভ্রমণকারীর এই ছবি সবসময় আমাকে আকৃষ্ট করতো।"

নাবিক হয়ে বিশ্ব ভ্রমণের সাধ ছিল বালক পলের। সতেরো বছর বয়েসে একটা বাণিজ্য জাহাজে পাইলটের শিক্ষানবিশ হল সে। কুড়ি বছরে পুরোপুরি খালাসী। বয়লারে কয়লা দেওয়া তার কাজ। সমুদ্রের লোনা হাওয়া, কঠোর পরিশ্রম, নতুন নতুন দেশের অভিজ্ঞতা সেই নবীন যুবার মন ও শরীর শক্ত করে গড়ে তুললো। এমনিতেই বেশ লম্বা চেহারা ছিল ছেলেটির—এখন তার দেহ যেন হয়ে উঠল পৌরুষের প্রতীক। নাবিকদের মুখে মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প, কুসংস্কার ঘুরে বেড়ায়। তাদের মুখ থেকে গগ্যাঁ শুনলেন পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের গল্প। সেখানে প্রচুর সুস্থ রৌদ্রালোক, অফুরন্ত সবুজ, বিনা পরিশ্রমে আহার মেলে, মেয়েরা সহজভাবে এসে ধরা দেয়। গগ্যাঁর কাছে মনে হতো সে এক স্বপ্নের দেশ। সেই সরল আদিম জীবনের স্বাদ নেবার গোপন ইচ্ছে জেগে উঠত তাঁর মনে।

নাবিকের জীবন আর ভালো লাগে না। ছ'বছর বাদে চাকরি ছেড়ে দিলেন। ততদিনে মা মারা গেছেন, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। দেশে ফিরে এসে দেখলেন তিনি নিঃসঙ্গ, কোনো পারিবারিক বন্ধন নেই। কিন্তু

গগ্যাঁর একটি শান্ত গৃহের জন্য লোভ তখন। মায়ের এক পরিচিত ব্যক্তির চেষ্টায় প্যারিসে স্টক এক্সচেঞ্জে চাকরি পেলেন। একটি ডেনিশ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, মেয়েটির নাম মেৎ, অল্পদিনে প্রণয়—তারপর বিবাহ এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে দেখা গেল একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হিসেবে। প্রায় বৎসর বৎসর পুত্রকন্যা জন্মাতে লাগল—সংসার এবং স্ত্রীকে সুখী করবার জন্য চাকরিতে উন্নতির প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। উন্নতিও হল। কোন এক বছরে গগ্যাঁ আয় করেছিলেন প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।

এ পর্যন্ত গগ্যাঁর জীবন কাহিনীতে বিস্ময়কর কিছু নেই। মাঝে মাঝে ছবির প্রদর্শনী দেখতে যেতেন। সখে বা কৌতুকে নিজেও মাঝে মাঝে আঁকবার চেষ্টা করতেন। ব্যস্ত চাকুরীজীবীরা যেমন রবিবার বা ছুটির দিনে শহরের বাইরে কোথাও মাছ ধরতে যায়—গগ্যাঁও তেমনি সখ করে শহরের বাইরে বেড়াতে গিয়ে রং তুলি নিয়ে খেলা করতেন। কিছু কিছু শিল্পীদের ছবিও কিনলেন এই সময়। সেজান, মানে, মনে সিসলে, পিসেরো, রেনোয়া প্রভৃতি শিল্পীদের কাজ দেখা যেতে লাগল গগ্যাঁর বাড়ির দেওয়ালে।

কিন্তু সামান্য সখও অনেক সময় বড় মারাত্মক হয়ে ওঠে। রং তুলি যেদিন হাতে নিলেন সেদিন থেকেই গগ্যাঁর রক্তে সর্বনাশের চিহ্ন লেগে গেল। তাঁর ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর জীবনের সূত্রপাত হল এখানেই। যেন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, 'একবার যখন তুমি শিল্পীর অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছো, তখন ছুঁড়ে ফেলে দাও ব্যবসায়ীর তুলাদণ্ড'! পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস যখন পল গগ্যাঁর—তখন থেকে তিনি হয়ে গেলেন অন্য মানুষ! এর পরের কুড়ি বছর যেন সম্পূর্ণ রহস্যময় একটি লোকের—অথবা বলা যায় বিশাল চেহারার এক বালকের কাহিনী।

শিল্পী পিসেরো ছিলেন তাঁদের পরিবারের বন্ধু। তিনি ক্রমে ক্রমে গগ্যাঁকে তাঁর শিল্পীবন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—সেইসব শিল্পীরা শিল্পের কাছে উৎসর্গীকৃত প্রাণ—দারিদ্র্যে এবং নোংরামীর মধ্যেই জীবন কাটান। তাঁরা এই সৌখিন শিল্পীটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তখন পর্যন্ত গগ্যাঁ কিছুই প্রায় আঁকেন নি, তাঁর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু শিল্পচর্চা ক্রমেই গগ্যাঁর কাছে প্রতিদিনের প্রধান জরুরী কাজ হয়ে উঠছে।

প্রথম প্রশংসা পেলেন নগ্ন মূর্তি আঁকার জন্য। সমালোচক হুসমান লিখলেন, এমন বাস্তব নগ্নমূর্তি খুব কমই আঁকা হয়েছে। ছবিটির সর্ব অঙ্গ যেন

জীবিত।—হায়, তিনি তখন জানতে পারেন নি যে, এই শিল্পীই অতি শীঘ্র বাস্তবতার প্রধান শত্রু হয়ে উঠবেন। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের অভ্যুত্থান ঘটছে তখন। গগ্যাঁ অবিলম্বে তাঁদের প্রবল সহচর হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইমপ্রেশনি-জমকেও ছাড়িয়ে গেলেন শীঘ্রই। সাহিত্যে তখন মালার্মেকে কেন্দ্র করে সিম্বলিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠছে। মালার্মে ছিলেন গগ্যাঁর বন্ধু এবং গুণগ্রাহী। গগ্যাঁ ছবির জগতে সেই আন্দোলন নিয়ে এলেন—সাহিত্য যা সিম্বলিজম—ছবিতে তার নাম সিনথেসিজম—পল গগ্যাঁ এই রীতির জনক বলা চলে।

একদিন গগ্যাঁ তাঁর স্ত্রীকে বললেন যে, তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন—তাঁকে সর্বক্ষণ আঁকতে হবে। মেৎ তো আকাশ থেকে পড়ল। বারো বছর দাম্পত্য-জীবন কেটেছে তাদের—কোনদিন তো লোকটিকে এমন হঠকারী মনে হয়নি। তাছাড়া বিয়ের সময় বা পরে এতদিন কাটল, মেৎ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি এই লোকটির মধ্যে কোনোরকম শিল্পী হবার প্রেরণা আছে। বেশ সুস্থ, স্বাভাবিক, সংসারনিষ্ঠ মানুষ। হঠাৎ একি দুর্মতি!

পরিবারের জন্য কোনরকম সংস্থান না করেই গগ্যাঁ সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দিলেন। খরচ সঙ্কুলানের জন্য প্যারিসের ব্যয়বহুল ফ্ল্যাট এবং স্টুডিও ছেড়ে দিতে হল—গ্রামের দিকে চলে গেলেন সপরিবারে। ক্রমাগ্রসরমান দারিদ্র্যে বিভীষিকার মধ্যে কাটল আট মাস। তারপর ডেনমার্কে তাঁর স্ত্রীর দেশে চলে যেতে হল। সেখানেও মানিয়ে থাকা অসহ্য প্রায়। কোন-রকম রোজগার করেনা বা করতে চায় না—শুধু ছবি আঁকে এমন জামাতার প্রতি শ্বশুরালয়ের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি প্রতিদিন তাঁর গায়ে বিঁধতে লাগল। সেই দৃষ্টির উত্তরে বা প্রতিবাদে গগ্যাঁ যে ব্যবহার করতে লাগলেন তা দেখে চমকে ওঠা বা ভয় পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সেই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষটি কোথায় হারিয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রীর আয়োজিত এক চায়ের পার্টিতে গগ্যাঁ প্রায় উলঙ্গ হয়ে প্রবেশ করলেন শুধু এই কারণে যে পার্টিতে উপস্থিত মেয়ে পুরুষেরা কি রকম আঁৎকে ওঠে তাই উপভোগ করবার জন্য।

জীবন ক্রমে অসহনীয় হয়ে এলো ডেনমার্কে। তাঁর মন প্যারিসে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল। কিছুদিনের জন্য প্যারিস যাই, তারপর টাকা পাবার একটা ব্যবস্থা করেই তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবো—স্ত্রীকে এই কথা বললেন গগ্যাঁ। তারপর ছ'বছরের ছেলে ক্লভিসকে নিয়ে চলে এলেন প্যারিসে। নিতান্ত সাময়িক বিচ্ছেদ—এইভাবে স্ত্রী রাজী হয়েছিল। গগ্যাঁর ধারণা ছিল কিছুদিনের মধ্যে যে কোন উপায়ে অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু—সারা-

জীবনে আর কখনো স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থাকার সুযোগ পান নি।

এসময় গগ্যাঁর প্যারিসের দিনগুলি নিদারুণ দুঃসময়ের অন্তর্গত। স্ত্রীকে লেখা তখনকার দু'একটি চিঠির টুকরো, "বাচ্চাটার যখন স্মল পক্স হলো তখন আমার পকেটে মাত্র কুড়ি নয়া পয়সা এবং গত তিনদিন ধরে আমরা শুধু ধার করে কেনা শুকনো রুটি খেয়েছি।"…"আমি একটা কাঠের তক্তার ওপর শুয়ে আছি। দিনের দুর্ভাবনার সঙ্গে রাত্রির অনিদ্রা বেশ সমতা রক্ষা করে"… "সৌভাগ্যক্রমে সাতাশ দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত আমাকে ওরা তাড়িয়ে দিল।"—অর্থাৎ হাসপাতালে অন্তত খাওয়া পরার ভাবনা ছিল না। ছেলের অসুখ, অনাহারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গগ্যাঁ একটা চাকরি নিলেন, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগানো, মাইনে দিনে মাত্র পাঁচ ফ্রাঁ। তাও চাকরি চাইতে গেলে অফিসের কর্তা তাঁর সুবিশাল বুর্জোয়া চেহারা দেখে হেসে ফেললেন এবং কিছুতেই চাকরি দিতে চাইলেন না। তাঁকে অতি কষ্টে বোঝাতে হল যে, চেহারা যাই হোক—গগ্যাঁর বাড়িতে তাঁর ছেলে মুমূর্ষু এবং ক'দিন ধরে কিচ্ছু খাবার জোটেনি।

এরকমভাবে আর দিন কাটে না। কোনক্রমে ক্লভিসকে একটা বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে গগ্যাঁ ব্রিটানিতে পালিয়ে গেলেন। সেখানে অনেক শিল্পী সস্তায় জীবন ধারণ করে ছবি এঁকে। পরে একজন সমালোচক গগ্যাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে সময় তাঁর ব্রিটানিতে যাবার কারণ কি? একটিমাত্র শব্দে গগ্যাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিষাদ।' এই ব্রিটানিতে গগ্যাঁ বারবার ফিরে এসেছেন। এখানে তাঁর ছবি নিজস্ব ভাষা খুঁজে পায়। ব্রিটানির বিষাদময় প্রাকৃতিক দৃশ্য, অধিবাসীদের সরল জীবন বারবার আকৃষ্ট করেছে তাঁকে। মৃত্যুর সময়েও বহুদূর থেকে এই ব্রিটানির কথা মনে পড়েছিল তাঁর। ব্রিটানি থেকে ফিরে প্যারিসে মমার্তে ভ্যান গগের সঙ্গে আলাপ হয় গগ্যাঁর। এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত এক মারাত্মক পরিণতি এনেছিল।

তখন গগ্যাঁর রক্তে কি যেন এক অনির্দিষ্ট ছটফটানি। প্যারিসও ভালো লাগছে না—তাঁর বুকের ভিতর নতুন শিল্পরীতি যেন আঘাত করছে অথচ প্রকাশিত হতে পারছে না। "সামনের মাসে এপ্রিলের দশ তারিখের জাহাজে আমি আমেরিকা যাচ্ছি। এখানে এত ঋণ, আর নির্যাতন আর ভরসাহীন অস্তিত্ব আমার অসহ্য লাগছে। আমি মনের পরিচ্ছন্নতার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজী আছি।…আমার কাছে শুধু যাবার ভাড়া আছে, আমেরিকায়

পৌঁছব কপর্দক শূন্য অবস্থায়। আমি কি করতে চাই তা আমি এখনও জানি না—কিন্তু আমার ইচ্ছে শুধু প্যারিস থেকে পালানো—এ শহর গরীবের কাছে মরুভূমির মত।”

পানামার কাছে টোব্যাগো দ্বীপে কোনো সভ্য মানুষ নেই, খাবার কোনো চিন্তা নেই, প্রকৃতি ঐশ্বর্যময়ী—সেখানে নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকবেন এই ছিল বাসনা। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন, হায়, ততদিনে পানামা খাল কাটা হয়ে গেছে—মাটিকাটা মজুরেরা উপনিবেশ গড়েছে সেখানে। বেঁচে থাকার জন্য মাটি কাটা কুলির কাজ নিতে হল গগ্যাঁকে—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম, মজুরি মাত্র কয়েক আনা। ততদিনে শিল্পী হিসাবে গগ্যাঁ প্রসিদ্ধ, সে সময়কার আঁকা ছবিগুলির দাম এখন লক্ষ লক্ষ টাকা। সেখান থেকে কিছুদিন পর গেলেন মার্টিনিক দ্বীপে। মার্টিনিক সত্যিই মনোরম। এত আলো, রঙ, অদেখা দৃশ্য, অধিবাসীদের অদ্ভুত রীতিনীতি তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করল। ইমপ্রেশানিস্টদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হল এখানে। রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হতে শুরু করলেন, মূর্তির চারপাশে বৃত্তের আভাস দেখা দিল! নতুন শিল্পীর জন্ম হল। মালার্মে তাঁর সম্বন্ধে পরে মন্তব্য করেছিলেন, “এইটাই খুব অসাধারণ যে, একজন শিল্পী অতখানি উজ্জ্বলতার মধ্যে অতখানি রহস্য কি করে রাখতে পারে!”

কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। প্রতিদিন কলেরায় অসংখ্য লোক মরে। মারাত্মক আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে গগ্যাঁকে ফিরে আসতে হল প্যারিসে।

এবার প্যারিসে এসে দু' একজন পৃষ্টপোষকের সহায়তায় একক প্রদর্শনী করলেন ছবির। সমালোচকের প্রশস্তি পেলেন প্রচুর, কিন্তু ছবি বিক্রী হল না। আবার কিছুদিন দারিদ্র্য এবং ব্যাধি ভোগ করার পর আহ্বান পেলেন ভ্যান গগের কাছ থেকে। ভান গগ্ থাকতেন দক্ষিণ ফ্রান্সে, আর্লে। সেখানে দুই বন্ধুর শিল্প সম্পর্কে আলোচনায় এবং ছবি এঁকে চমৎকার দিন কাটলো কয়েকটি। কিন্তু ঋদ্ধিবান পুরুষ কখনো অপরের প্রতিভা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া ভ্যান গগের মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল তখনই। দুই বন্ধুর সম্পর্ক ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠল। একদিন প্রায় বিনা কারণেই ভ্যান গগ্ একটা কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মারলেন গগ্যাঁর মাথায়। আর একদিন গগ্যাঁ পথ দিয়ে হাঁটবার সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁর পেছনে ছুটে আসছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন একটা ধারালো ক্ষুর নিয়ে ভ্যান গগ্ ছুটে আসছেন তাঁকে খুন করতে। প্রতিরোধের জন্য বিশালদেহী গগ্যাঁ

ফিরে দাঁড়াতেই আবার ছুটে পালিয়ে গেলেন তিনি। এবং সেই রাত্রেই ভ্যান গগ্‌ নিজের একটা কান কেটে উপহার পাঠালেন স্থানীয় এক রমণীকে। এরপর আর সেখানে থাকা যায় না। ক্ষুণ্ণ মনে গগ্যাঁ ফিরে গেলেন ব্রিটানিতে। ভ্যান গগের পরবর্তী পরিণতি পাগলা গারদে।

তাহিতি দ্বীপের নাম গগ্যাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই দ্বীপেই গগ্যাঁর শিল্পপ্রতিভার চরম বিকাশ হয়েছিল—এবং এই দ্বীপেই অত্যাচারে অবিচারে তাঁর চরম দুঃখময় শেষ জীবন কেটেছে। ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতি ক্রমশ চরম বিতৃষ্ণা এসেছিল তাঁর। আদিম জীবন যাপন তাঁর কাম্য। তাছাড়া প্যারিসে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। ছেলে-মেয়েদের দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু স্ত্রীর কড়া চিঠি আসে, 'আগে টাকা জোগাড় করো তারপর ছেলেমেয়েদের দেখবে।' তাহিতি দ্বীপে পালাবার ভাড়া জোগাড় করার জন্য গগ্যাঁ তাঁর ছবি বিক্রীর ব্যবস্থা করলেন। বন্ধু-বান্ধবদের প্রচেষ্টায় বহু ছবি বিক্রী করা হল। যাবার আগে ভোজসভায় কবি মালার্মে গগ্যাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

তাহিতিতে পৌঁছে প্রথমে খুব খারাপ লাগল। এখানে সেই ঔপনিবেশি-কতার নোংরামি, ইওরোপের সস্তা অনুকরণ—গগ্যাঁর সহ্য হল না। তিনি ইওরোপীয়দের সংসর্গ থেকে দূরে ক্রমশ আদিবাসীদের মধ্যে চলে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল—তারা তাঁকে খাবার এনে দেয়, ওখানকার আতিথেয়তার রীতি অনুযায়ী প্রতিদিন একটি করে মেয়ে এসে তাঁর সঙ্গে রাত কাটিয়ে যায়। তেহুরা নামে একটি মেয়েকে নিয়ে গগ্যাঁ একটা কুটির বাঁধলেন—সেই থেকে গগ্যাঁর জীবন ঐ আদিবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে গেল। কিন্তু আবার অসুখে পড়লেন এখানে। বাধ্য হয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসতে হল। টাকার সমস্যা জামা কাপড়ের মত সব সময় তাঁর গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

হঠাৎ অভাবনীয় সৌভাগ্য এল তাঁর জীবনে। কোন এক কাকার মৃত্যুতে আচমকা তিনি কিছু টাকার উত্তরাধিকারী হলেন। ধার শোধ করে গগ্যাঁ তাঁর ছবির একটি সুন্দর প্রদর্শনী করলেন। এ প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই এখন বিশ্ববিখ্যাত, সমকালের ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। একটা স্টুডিও ভাড়া নিয়ে গগ্যাঁ একটি জাভানিজ মেয়েকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। এই মেয়েটি গগ্যাঁর অনেক ছবিতে স্থান পেয়েছে। কিছুদিন চূড়ান্ত সৌখিনতা করলেন এখানে। লাল-নীল-হলদে-কালো এমন সব পোশাক পরে রাস্তায় বেরুতেন—

যে তাঁকে দেখবার জন্য রাস্তায় ভীড় জমে যেত—অনেকে হাততালি দিত তাঁর পিছনে পিছনে, কুকুরগুলো ডেকে উঠত ঘেউ ঘেউ করে।

একদিন আন্না নামের সেই জাভানিজ মেয়েটিকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসবার সময় কয়েকটি নাবিক অশ্লীল মন্তব্য করে। চট করে পেছন ফিরেই গগ্যাঁ একটা নাবিকের নাকে বিরাট ওজনের ঘুঁষি চালান, শুরু হয়ে যায় লড়াই। গগ্যাঁর অজান্তে একজন তাঁর পায়ে এমনভাবে মারে যে, গোড়ালি ভেঙে যায়। এই গোড়ালি আর কখনো সারেনি। কিন্তু এই আন্না মেয়েটির প্রতি গগ্যাঁর ঐ রকম আকর্ষণের চমৎকার প্রতিদান পেয়েছিলেন! গগ্যাঁ যখন হাসপাতালে তখন মেয়েটি তাঁর স্টুডিও লুট করে পালিয়ে যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই গগ্যাঁ তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, কিছু বিক্রির ব্যবস্থা করে চিরজীবনের মত প্যারিস ছেড়ে চলে যান। আবার তাহিতি। এবার গগ্যাঁ একেবারে সম্পূর্ণ ওখানকার আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেলেন। কিন্তু এখন আর সেই সবল শরীরের মানুষটি নেই। শরীরে ঢুকেছে সিফিলিস, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, বেড়ে যাচ্ছে ভাঙা পায়ের ঘা এবং আবার অর্থাভাব। তেহুরা মেয়েটি নেই—পাহুরা নামে আর একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন।

গগ্যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, পৃথিবী গগ্যাঁর উপরে কোন ছাপ রাখতে পারেনি—কিন্তু গগ্যাঁ পৃথিবীর উপর নিজের ছাপ রেখেছেন। সামাজিক বা ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন গগ্যাঁ এই দ্বীপের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন—এদের প্রতি ফরাসী কলোনিয়ানদের অত্যাচার তাঁর রক্ত গরম করে তুলল। ফরাসী শাসকরাও তাঁর অদ্ভুত চরিত্র, ব্যবহার, আদিবাসীদের সঙ্গে মেশামেশি সুনজরে দেখল না। গগ্যাঁ গীর্জায় যেতেন না—বাড়িতে বসে ছবি আঁকতেন। একটি নগ্ন নারীমূর্তি, তার পাশে একটি সিংহী—এই রাখা ছিল তাঁর বাড়ির সামনে। পাদ্রীরা ওরকমভাবে মূর্তি রাখার জন্য আপত্তি করতে এলে গগ্যাঁ কর্ণপাত করলেন না।

রোগে শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে, অর্থচিন্তা যেন শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে—কিন্তু তবুও গগ্যাঁ এক মানবিক কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আদিবাসীদের প্রতি সুবিচার এবং ফরাসীদের অত্যাচার নিয়ে আন্দোলন শুরু করতে চাইলেন। ওখানকার কাগজে কড়া প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন ফরাসীদের নামে। তাঁর কুঁড়েঘর থেকে মাঝে মাঝে জিনিসপত্র চুরি যায়—কিন্তু ফরাসী হাকিম তাঁর বিচার করে না। গগ্যাঁ কাগজে চিঠি লিখলেন, ঐ অপদার্থ

হাকিম এসে তাঁর সঙ্গে ডুয়েল লড়ুক অথবা ফ্রান্সে ফিরে যাক।

এই সময় গগ্যাঁ একবার ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু একটা বড় ছবি আঁকা বাকি আছে। আত্মহত্যার দিন পিছিয়ে দিয়ে গগ্যাঁ এক বিশাল ছবি আঁকলেন, আমরা কোথা থেকে এসেছি—আমরা কোথায় আছি—এবং আমরা কোথায় চলেছি। তারপর আত্মহত্যার জন্য বিষ খেলেন। কিন্তু আর্সেনিক খেয়েও তাঁর মৃত্যু হল না। বমি হয়ে বেঁচে গেলেন। পায়ের ঘা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে—হাসপাতালে যেতে হল—সেখানে গগ্যাঁর নামে কার্ড লেখা হল—'পল গগ্যাঁ, একজন ভিখারী'।

অরণ্যে ঘেরা নিজের কুটিরে শুয়ে আছেন একদিন, দেখলেন দূরে তাহিতির গভর্নর অনেক লোকজন নিয়ে নৌকো থেকে নামছেন। তারপর প্রচুর হাসির ফোয়ারা, মদ, উৎসব, ঘুরে ঘুরে গভর্নরসাহেব ফটো তুলছেন। দেখতে দেখতে গগ্যাঁর শরীর জ্বলে গেল। গভর্নরকে একটা চিঠি লিখলেন, 'যখন ক্যামেরার চোখ দিয়ে তোলা ছবিগুলোর দিকে আপনি তাকাবেন, তখন দেখবেন কত সুন্দর এই দেশ, সৌন্দর্য এবং সতেজতা যেন মানুষকে খুশী করবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু একবার যদি নিজের চোখ খুলে তাকান, দেখবেন—প্রত্যেকটি কুঁড়েঘরে অবিচার—ঘরে ঘরে কঠিন দারিদ্র্য এবং অপমৃত্যু'।

সে চিঠি উপেক্ষিত হল। কিছুদিন পর কলোনিয়াল ইন্সপেক্টার সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে উপস্থিত হতে গগ্যাঁ তাঁকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখে জানালেন, কিভাবে এখানকার লোকদের প্রতি অত্যাচার করা হয়, ফরাসীরা শোষণ করে, এরা কোনরকম বিচারের সুযোগ পায় না। এই চিঠির এক কপি পাঠিয়ে দিলেন ফরাসী দেশের কাগজে।

আর একটি চিঠিতে লিখলেন, ফরাসীরা ফাঁসীর আসামী বলে যে আদিবাসীটিকে হত্যা করছে সে আসলে নির্দোষ।—ফরাসী শাসকরা ঐ আধ-পাগলা লোকটিকে, যে নিজের জাতভাইদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, তাকে আর সহ্য করল না। চিঠির উত্তরের প্রত্যাশা করছিলেন গগ্যাঁ, তার বদলে পেলেন আদালতের সমন। এই অমর প্রতিভাবান শিল্পীকে যখন দেওয়া উচিত ছিল সুখাদ্য, সুচিকিৎসা এবং দুশ্চিন্তাহীন আশ্রয়—তখন দেওয়া হল অপমান, উপেক্ষা এবং বিচারের ভয়। বিশেষতঃ শেষ জীবনে গগ্যাঁর শিল্প-প্রতিভা অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু একটু সমর্থন বা উষ্ণতা তাঁর জোটেনি।

আদালতে প্রায় গগ্যাঁকে নিয়ে হাসি-তামাসা করা হতে লাগল। জাতে

লোকটা খাঁটি ইউরোপীয় অথচ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়িয়েছে আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে। কোথায় থাকবে সাহেব বাড়ির বাংলোয়, মেম-সাহেবদের সঙ্গে ফুর্তি করবে, হাজির হবে নিত্য নতুন পার্টিতে, তা নয়, লোকটা বুনো জংলীদের সঙ্গে জংলী হয়ে আছে! গগ্যাঁর জীবনী অবলম্বনে একটি উপন্যাসে এই রকম আদালতের সংলাপ দেওয়া আছে।

—তোমার কোন সাক্ষী আছে?

—সমস্ত দ্বীপ আমার সাক্ষী!

—কোনো ইউরোপীয়?

—না।

তারপর হাকিম সেই কাগজের চিঠির উল্লেখ করলেন যেটাতে তিনি হাকিমকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। গগ্যাঁ বললেন, সে চিঠির এখন উল্লেখ করছেন কেন? এটা বে-আইনী।

—আমাকে আইন শেখাবেন না। যেমন আপনাকে আমি ছবি আঁকা শেখাতে যাবো না। আপনি যে ফরাসী রাজ-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এত সব অভিযোগ করেছেন—তার প্রমাণ কোথায়?

—সম্পূর্ণ দ্বীপ আমার প্রমাণ। অবিচারের কথা সকলেই জানে যদি কোনো ভগবান থেকে থাকেন—তাঁরও জানা উচিত। এসব তামাসার মানে কি?

—চুপ! তোমার কাজই হলো গণ্ডগোল পাকানো।

—আপনি তো আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দিচ্ছেন না।

—ফরাসী সুবিচার সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ।

সুতরাং মানহানির দায়ে গগ্যাঁর তিনমাস জেল এবং এক হাজার ফ্রাঁ অর্থদণ্ড হল। এ শাস্তি গগ্যাঁর পক্ষে অকল্পনীয়। বিশেষত ঐ অর্থদণ্ড। "আমি এক বিষম ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি। এবার আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবো।" একেবারে সহায় সম্বলহীন, একটা বন্ধু নেই, টাকা পয়সা নেই, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, শরীরে কঠিন অসুখ—তবু গগ্যাঁ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অবিচারের বিরুদ্ধে। নির্যাতিত, মূক আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন নিজেরই সভ্য দেশবাসীদের প্রতি। কিন্তু তাঁকে জেলে পুরে মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা হতে লাগলো। গগ্যাঁ আপীল করলেন।

কিন্তু পৃথিবীর কোন বিচারকের কাছ থেকে সুবিচার পাবার সৌভাগ্য তাঁর কখনও হয় নি। কারাদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় এসে গেলো অল্প দিনের মধ্যেই, ১৯০৩ সালের মে মাস তখন, ঘরের মধ্যে একা, হঠাৎ গগ্যাঁর

হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। শুভার্থীরা এসে দেখল সেই অপরাভূত মূর্তি। একটা পা বিছানা থেকে বেরিয়ে এসেছে—যেন মৃত্যুর আগে একবার শেষবারের মত উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কি নিঃসঙ্গ সেই মৃত্যু! মাথার কাছে অসমাপ্ত ছবি 'ব্রিটানির তুষার'। বুঝি বারে বারে স্বদেশের কথা মনে পড়েছিল।

কারাদণ্ড থেকে এমন চালাকি করে অব্যাহতি পেলেও অর্থদণ্ড থেকে ফরাসী সরকার তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি। জরিমানা আদায়ের জন্য গগ্যাঁর ঘরের সমস্ত আসবাব নীলাম করা হলো। নীলামের সময় সকলের সে কি হাসাহাসি! মহা-মূল্যবান ছবিগুলি দু-চার টাকায় বিক্রী হয়ে গেল। 'ব্রিটানির তুষার' ছবিটি উল্টো করে ধরে নীলামওয়ালা বললো, 'এটা কি? নায়েগ্রা জলপ্রপাত নাকি? মন্দ নয়, সাতফ্রাঁ দেওয়া যায়।'

গগ্যাঁ সরল এবং আদিম হতে চেয়েছিলেন। সভ্যজগৎ থেকে বহু দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের সেই দ্বীপের মাটির মধ্যে মিশে রইলেন।

অস্কার ওয়াইল্ডের অকালমৃত্যু

আলফ্রেড ডগলাসের বাবা লর্ড ক্যুইনসবেরি একদিন সক্রোধে এসে অস্কার ওয়াইল্ডের বাড়ির দরজার বোতাম টিপলেন। সঙ্গে এসেছেন এক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন গুণ্ডা। ক্যুইনসবেরির মুখ লাল, উত্তেজনায় তাঁর চোখ জ্বলছে। ওই বদমাস, লম্পট, নোংরা নাট্যকারটিকে আজ সমুচিত শিক্ষা দিয়ে যাবেন।

ওয়াইল্ডের ছোকরা চাকর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আগন্তুক দুজনকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে প্রভুকে ডাকতে গেল।

অস্কার ওয়াইল্ড এসে দাঁড়াতেই ক্যুইনসবেরি হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'বসো, কথা আছে'!

—আমার বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও আমার সঙ্গে কাউকে এরকম-ভাবে কথা বলার অধিকার আমি দিই না। ঠাণ্ডা গলায় ওয়াইল্ড বললেন। 'আমার ধারণা আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন, আপনার ছেলের কাছে আমার ও আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যেসব কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন, তার জন্য। ওরকম চিঠি লেখার জন্য আমি যে কোন দিন আপনাকে কোর্টে দাঁড় করাতে পারি!'

—ক্যুইনসবেরি চেঁচিয়ে বললো, কী? তুমিই আমায় উল্টে অভিযোগ করছো? 'আমার ছেলের কাছে যা ইচ্ছে লেখার স্বাধীনতা আমার আছে।'

—'কিন্তু কোন্ সাহসে আপনি আপনার ছেলে এবং আমার নাম জড়িয়ে নোংরা কথা বলেছেন?'

—'স্যাভয় হোটেল থেকে কুৎসিত ব্যবহার করার জন্য তোমাকে এক মিনিটের নোটিশে তাড়িয়ে দেয় নি?'

—'মিথ্যে কথা।'

—'তুমি পিকাডিলিতে আমার ছেলের জন্য সাজানো ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন না?'

—'কেউ নিশ্চয়ই ডগলাস এবং আমার নাম করে আপনাকে অদ্ভুত সব মিথ্যে কথা বলেছে। এ সব কিচ্ছু আমি করিনি।'

একথা বলার পরই ওয়াইল্ড আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। সুতরাং তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'লর্ড ক্যুইনসবেরি, আপনি কি সত্যিই আপনার ছেলে এবং আমার অসদাচরণের অভিযোগ করছেন?'

—'আমি ঠিক তা না বললেও, তোমরা অসদাচরণের ভান করছো। সেটাও অত্যন্ত খারাপ। এরপর যদি আমি কখনো কোন হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে তোমাকে এবং আমার ছেলেকে একসঙ্গে দেখতে পাই, তবে তোমাকে আমি ঠাণ্ডা করে দেবো!'

—'ক্যুইন্সবেরিদের নিয়ম কি তা আমি জানি না, কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ডের নিয়ম সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা। এখুনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান!'

—'বিরক্তিকর গল্প রটেছে চারদিকে এই নিয়ে।' ক্যুইনসবেরি বলে উঠলেন।

—'যদি তাই হয়, তবে তা আপনিই রটাচ্ছেন, আর কেউ নয়!'

একথার পর ওয়াইল্ড ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডাকলেন এবং আঙুল দিয়ে অনাহূত অতিথিদের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই লোকটি ক্যুইনসবেরির মার্কুইস, লণ্ডনের জঘন্যতম বদমাস। একে কখনো আর আমার বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।' তারপর ওয়াইল্ড দরজা খুলে দিয়ে বললেন, গেট আউট!

চাকরের তো অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা! এত বড় একজন লর্ডকে কেউ কখনো এমন করে অপমান করেছে! কিন্তু ক্যুইনসবেরি এবং তাঁর পার্শ্বচরকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যেতেই হল মাথা গুঁজে, দীর্ঘকায় ওয়াইল্ডের কঠিন মূর্তির সামনে দিয়ে।

এই ঘটনা যখন আলফ্রেড ডগলাস শুনলেন, তখন বললেন, 'বাবা বলেছে, তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে দেখলেই ঠাণ্ডা করবে, আচ্ছা!' এর পর ডগলাস বাবাকে পর পর চিঠি লিখে জানাতে লাগলেন, কবে, কখন এবং কোথায় তাঁকে এবং অস্কার ওয়াইল্ডকে একসঙ্গে দেখা যাবে! সেই সঙ্গে নোট জুড়ে দিতেন, 'যদি তুমি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করো, তবে আমি একটা গুলিভরা পিস্তল দিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করবো।' ক্যুইনসবেরিকে বাধ্য হয়ে কিছুদিন এ ব্যাপার হজম করতে হল। ক্যুইনসবেরি ছিলেন পাগলাটে ধরনের, দাম্ভিক, দূষিত চরিত্রের অভিজাত। পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল খুব খারাপ—ডগলাসের মায়ের উপর তিনি অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন—সেজন্য ক্যুইনসবেরির ইচ্ছে ছিল সমস্ত পৃথিবী তাঁর হুকুম মত চলবে। এবং তাঁর ছেলের সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সম্পর্ক থাক বা না থাক অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে তাঁর ছেলের মেশা চলবে না।

লর্ড আলফ্রেড ডগলাসকে অস্কার ওয়াইল্ড সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। ঐ রূপবান দীর্ঘকায় যুবক, কবিত্বমণ্ডিত, সুশ্রী, তেজী,

অহংকারী আলফ্রেডকে যেদিন অস্কার দেখলেন, সেদিন থেকেই দুজনের নিবিড়ভাবে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আলফ্রেডকে অস্কার অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন। উচ্ছ্বাস এবং কবিত্বময় সেই সব চিঠি। 'যেমন তোমার কৃশ স্বর্ণমণ্ডিত আত্মা কাব্য এবং বাসনার মধ্যপথ দিয়ে চলে। আমি হায়াসিনথাসকে জানি, যাকে অ্যাপোলো পাগলের মত ভালবাসতো, তুমি ছিলে সেই গ্রীকদের কালে··· কবে তুমি স্যালিসবেরীতে যাবে? যাও, সেখানে গথিক সম্ভারের ধূসর গোধূলিতে তোমার হাত শীতল করো।'

বিখ্যাত অভিনেতা স্যার বিয়েরবোম ট্রি বলেছিলেন, এই যে তুমি লিখেছো, তোমার রক্ত-গোলাপের পাপড়ির মত ওষ্ঠ··ইত্যাদি এইসব চিঠির বিষয়-গুলিতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ওয়াইল্ড বলেছিলেন, এগুলি গদ্যকাব্য। ছন্দ পরালেই এগুলি গোল্ডেন ট্রেজারির মত সম্ভ্রান্ত সঙ্কলনে স্থান পেতে পারে।

—কিন্তু এগুলি তো ছন্দে নেই। বললেন, ট্রি।

—সেইজন্যই তো এগুলি গোল্ডেন ট্রেজারিতেও নেই! ওয়াইল্ডের উত্তর।

এই চিঠি অনেকগুলি আলফ্রেডের কাছ থেকে চুরি যায়! কিছু লোক এই চিঠিগুলি নিয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে। একদিন ওয়াইল্ড দেখলেন, থিয়েটারের স্টেজ ডোরের কাছে একটি লোক তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে এক তাড়া ওয়াইল্ডেরই লেখা চিঠি। দশ পাউণ্ড পেলে চিঠিগুলো সে ওয়াইল্ডকে ফিরিয়ে দিতে পারে—সে জানায়।

'দশ পাউণ্ড!' ওয়াইল্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তুমি মোটেই সাহিত্যের সমঝদার নও। এমন রচনার জন্য তুমি যদি পঞ্চাশ পাউণ্ড চাইতে আমি তাই দিতাম।' লোকটা যখন থতমত খেয়ে দাম বাড়াবে কিনা ঠিক করছে, তখন অস্কার আবার বললেন, 'কিন্তু ওগুলি তো আমার দরকার নেই। আমার কাছে কপি আছে। গুড নাইট!'

কিছুদিন পর আবার আর একটি লোক এসে বললো, লর্ড আলফ্রেডের কাছে লেখা আপনার সব চিঠিগুলো দিতে পারি ফেরত। আপনি কত দেবেন?

—টাকা দিয়ে ওর মূল্য নির্ণয় করা যায় না! সৌন্দর্যের মূল্য মণিমুক্তার চেয়ে বেশী।

—তিরিশ পাউণ্ড দিলে আপনি পেতে পারেন।

—কেন তিরিশ পাউণ্ড চাইছো?

—আমি আমেরিকা গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই।

—অদ্ভুত ইচ্ছে, তবে ঠিক ··কিছু মনে করো না···খুব নতুন কিছু নয়।

কলম্বাস তোমার আগে একথা ভেবেছিল।

ওয়াইল্ড তাকে তিরিশ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করলেন। কিছুদিন পরই সেই প্রথম লোকটি আবার এসে হাজির। অস্কার তাকে ধমকে বিদায় করার চেষ্টা করতে সে বললো, 'আপনার এ চিঠি থেকে কিন্তু অন্যরকম মানেও করা যায়, স্যার।'

—শিল্প কুলি মজুরদের কাছে খুব সহজে বোধ্য হয় না হে! নানারকম ভুল মানে করা স্বাভাবিক।

—একজন লোক কিন্তু স্যার, আমাকে এ চিঠির জন্য ষাট পাউণ্ড দিতে চেয়েছে।

—তুমি যদি আমার উপদেশ নিতে চাও, তবে এখুনি ছুটে গিয়ে তার কাছ থেকে ষাট পাউণ্ড নিয়ে নাও। আমি কখনো অত ছোট কোন গদ্যরচনার জন্য অত টাকা পাইনি। তবে আমি জেনে খুশী হলাম, ইংল্যাণ্ডে আমার চিঠি অত উচ্চ মূল্যে কিনে নেবার মত কোন সমঝদার আছে।

বলা হয়তো বাহুল্য, চিঠিগুলো পাগলের মত দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছিলেন ক্যুইনসবেরি। এবং তার কারণ সাহিত্যপ্রীতি মোটেই নয়।

অস্কার ওয়াইল্ডকে আলফ্রেড ডগলাসের সঙ্গে ঘন ঘন ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল—স্যাভয় হোটেলে বার বার। ইতিমধ্যে একবার দু'জনে বেড়িয়ে এলেন অ্যালজিরিয়া থেকে। অ্যালজিরিয়াতে দেখা হয়েছিল আঁদ্রে জিদের সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী পরে আঁদ্রে জিদ লিখেছিলেন—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবাস্তব। ডগলাস বলেছিলেন একথা। অপর একজন লেখক রেজিনাল্ড টার্নার বলেছিলেন, 'এমন ঐশ্বর্যময় মিথ্যা আগে কখনো লেখা হয়নি। সম্পূর্ণ বিবরণীটিই কাল্পনিক'—কিন্তু সে যাই হোক, অস্কারের চরিত্র নিয়ে তখন অনেক গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। অনেক পুরনো বন্ধু তাঁকে দেখে না-চেনার ভান করে পালাতে আরম্ভ করেছে।

লণ্ডনে ফিরে এসে ওয়াইল্ড শুনলেন যে, তাঁর নাটক 'দি ইম্পর্টেন্স অব বিয়িং আর্নেস্ট'-এর অভিনয়ের প্রথম রজনীতেই ক্যুইনসবেরি একটা টিকিট কিনেছেন গণ্ডগোল করার মতলবে। তাঁর টিকিট ক্যান্সেল করে দেওয়া হল। অভিনয়ের নির্দিষ্ট সময়ে ক্যুইনসবেরি এসে হাজির হলেন হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে—তার মধ্যে পচা ডিম, গাজর, শালগম। অভিনয়ের শেষে যখন নাট্যকার এসে দাঁড়াবে—তখন ছুঁড়ে মারবেন। কিন্তু ক্যুইনসবেরিকে ঢুকতে দেওয়া হল না, তিনি তখন মরিয়া হয়ে গ্যালারির টিকিটে, লাইনের টিকিটে

ঢোকবার চেষ্টা করলেন—সেখানেও লোক রাখা ছিল, শেষ পর্যন্ত স্টেজের দরজায়,—সেখানেও বাধা দেওয়া হল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে ক্যুইনসবেরি নতুন কৌশল ভাবতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রতিটি কাগজে যখন তিনি দেখলেন নতুন নাটকের বিরাট প্রশংসা, রাগে ক্যুইনসবেরি জ্বলতে লাগলেন এবং তিনদিন পর সোজা অ্যাবারমার্ল ক্লাবে গিয়ে ওয়াইল্ডের নামে একটা কার্ড রেখে এলেন। সেই কার্ডে লেখা ছিল, 'To Oscar Wilde posing as a Somdomite' (অত্যন্ত রেগে ছিলেন বলেই বোধহয় ক্যুইনসবেরি বানান ভুল করেছিলেন। আসল কথাটি হল Sodomite অর্থাৎ সডম নগরের অধিবাসী। এখনকার অর্থ—বিকৃত অভিগমনকারী, অর্থাৎ যে-পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে ভালোবাসে না, অপর কোনো পুরুষকে ভালোবাসে)।

বেশ কয়েকদিন বাদে অস্কার ওয়াইল্ড সেই ক্লাবে উপস্থিত হলে পোর্টার তাঁর হাতে সেই কার্ড দিল। কার্ড পড়ে ওয়াইল্ড আপাদ-মস্তক চমকে গেলেন, কিন্তু শান্তভাবে পোর্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই কার্ডে কি লেখা আছে দেখেছো?

'হ্যাঁ, দেখেছি স্যার,' বিনীতভাবে সে স্বীকার করলো, 'কিন্তু মানে বুঝতে পারিনি।' তবে অন্য কেউ দেখেনি, একথাও সে বললো। ওয়াইল্ড সোজা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবার্ট রসকে ডাকলেন এবং সামান্য পরামর্শ করে পরদিন ক্যুইনসবেরির নামে নালিশ করলেন আদালতে। পরোয়ানা বার করিয়ে ক্যুইনসবেরিকে গ্রেপ্তার করা হল। মামলার তারিখ পড়ল সাতদিন পরে। ক্যুইনসবেরি জামিনে মুক্তি পেলেন। শুরু হয়ে গেল ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী সমাজের শিরোমণি, অভিজাত পরিবারের নিমন্ত্রণে প্রধান আকর্ষণ, মঞ্চের রাজা, বিদ্যুৎ-দীপ্ত কবি অস্কার ওয়াইল্ডের পতন।

But strange that I was not told
That the brain can hold
In a tiny ivory cell
God's heaven and hell.

এই দুরকম জীবন অস্কার ওয়াইল্ড যাপন করে গেছেন। আঁদ্রে জিদকে একবার তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, আপনি কাল থেকে কি কি করেছেন। আঁদ্রে জিদ উত্তর দেবার পর আবার প্রশ্ন ঃ আপনি সত্যি সত্যিই এগুলি করেছেন?

—হ্যাঁ। জিদের উত্তর।

—তবে সেগুলি বলার দরকার কি ছিল? আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, সেগুলি অপ্রয়োজনীয়।…দুরকম পৃথিবী আছে, একটি পৃথিবী যা বাস্তব, যা আছে, এবং এর সম্বন্ধে কথা বলার কিছু নেই। এর নাম বাস্তব জগৎ, কারণ একে দেখবার জন্য কথা বলার দরকার হয় না। আরেকটি হল শিল্পের জগৎ। তার সম্বন্ধেই কথা বলা উচিত, নচেৎ তার অস্তিত্ব থাকবে না।…

অস্কার ওয়াইল্ড এই শিল্পের জগতে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ কর্মহীন জীবন। লেখার পরিশ্রমও করতে চাইতেন না। বাধা বন্ধনহীন জীবনই খাঁটি ধর্মজীবন। ওয়াইল্ড এই রকমভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেঁচেছিলেন বেশ প্রবলভাবে। আনন্দ, উল্লাস, উত্তেজনা, সাজপোশাক, নাটকীয়তা তাঁর জীবনের এগুলিই প্রধান ঘটনা। একবার গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, 'আমি আমার জীনিয়াস নিয়োগ করেছি আমার জীবনে, এবং শুধু মাত্র ট্যালেণ্ট নিয়োগ করেছি আমার লেখায়।' শেষ জীবনে যখন লিখতেন না, তখন বলেছিলেন—আমি আমার জীবনকে চিনতে পেরেছি, তাই আর লিখিনা। যখন জীবন কি চিনতুম না, তখন লেখার চেষ্টা করতুম।

নামকরা ডাক্তারের ছেলে, অক্সফোর্ডের ভালো ছাত্র অস্কার ওয়াইল্ড, যৌবনের প্রথমেই লণ্ডনে এসে স্থান করে নিতে দেরি হয়নি। লেখক হিসাবে নাম হবার আগে সারা লণ্ডনে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে নিয়ে 'পাঞ্চে' কার্টুন আঁকা হতো, খবরের কাগজে টিপ্পনি কাটা হতো, এমন কি মঞ্চে একাধিক ব্যঙ্গ নাটক অভিনীত হয়েছে যার মুখ্য চরিত্র ওয়াইল্ড। যেখানে যখন যেতেন—তাঁর অসাধারণ চেহারা, দীর্ঘ, উজ্জ্বল, মর্মভেদী এবং অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় লোকদের আকৃষ্ট করতেন তাঁর দিকে। তাছাড়া তখনকার শিল্পী সাহিত্যিকরা যে এস্থেটিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, অস্কার ওয়াইল্ড অবিলম্বে হয়ে গেলেন তার পাণ্ডা, অন্যেরা যা শুধু ভাবতো বা বলতো, অকুতোভয় ওয়াইল্ড কাজেও তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। এস্থেটদের প্রধান মত ছিল জীবনকে সুন্দর এবং শোভন করতে হবে, জামা কাপড়ের একঘেয়েমি চলবে না। অস্কার সন্ধ্যেবেলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন বিচিত্র ভেলভেটের কোট, বুকখোলা জামা পরে এবং বাটন হোলে এক বিরাট সূর্যমুখী ফুল। রাস্তার লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। এভাবে অবিলম্বে অস্কার বিখ্যাত এবং কুখ্যাত হয়ে পড়লেন এবং শুধু তাঁকে চোখে দেখবার জন্যও কত লোকের আগ্রহ। আমেরিকাতে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন অস্কার—তখনও তিনি প্রায় কিছুই লেখেননি, একটি ক্ষীণ কবিতার বই, কিন্তু সভায় সভায় ঐ অদ্ভুত

সাজপোশাক পরে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য কি ভিড় ! সাধারণ পোশাক পরে গেলে অনেক সভায় লোকেরা হতাশ হতো, আপত্তি করতো পর্যন্ত।

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, রসিকতার জন্য ওয়াইল্ড আজও বিখ্যাত। তাঁর অনেক কথা আজ প্রায় প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। যেমন কয়েকটি ঃ

'জীবনে আমাদের দু রকমের দুঃখ আছে। এক হচ্ছে যা আমরা চাই তা পাই না, আর একটি হল, আমরা তা পেয়ে যাই।'

'কোন পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোককে একবার ভালোবেসে ফেলে, তবে তারপর সে স্ত্রীলোকটির জন্য সব কিছু করতে পারে, তাকে ভালোবাসা ছাড়া।'

'মানুষের সব সময়ই ভালোবাসা উচিত। এবং সেটাই বিয়ে না করার প্রধান কারণ।'

'উপদেশ দেওয়া এক বিশ্রী জিনিস। কিন্তু সৎ উপদেশ দেওয়া সত্যি সাজ্যাতিক।'

'কর্তব্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা সব সময়ই মানুষ অপরের কাছ থেকে আশা করে। নিজে করে না।'

'Genius is born not paid.'

'আমি জীবনে সবকিছুই সংবরণ করতে পারি, শুধু লোভ ছাড়া !'

'মানুষ যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন সে কিছুতেই নিজের কথা বলে না। তাকে একটা মুখোস দাও, সে সম্পূর্ণ সত্যি কথা বলবে।'

অস্কার জীবনে বেশী কিছু লেখার সময় পাননি। গুটি তিনেক কবিতার বই, একটি উপন্যাস, কিছু ছোটদের জন্য অলৌকিক গল্প, কয়েকটি নাটক, প্রবন্ধ। জীবনে সাফল্যের চরম শিখরে উঠলেন যখন, তখনই এমন আঘাত পেলেন—যা তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল।

অস্কার ওয়াইল্ডের বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন স্যুইনবার্ন, ওয়াল্টার পেটার, ইয়েটস্, বার্নার্ড শ, মালার্মে, এমিল জোলা, জিদ—শিল্পীদের মধ্যে দেগা, পিসেরো, সার্জেন্ট প্রভৃতি। কবি পল ভেরলেইনের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল প্যারিসের এক রেস্তোরাঁয়, কিন্তু ভেরলেইন তখন নানা-জনের কাছ থেকে আবসাঁথের পয়সা জোগাড় করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এ ছাড়া দেশের বহু অভিজাত, সম্রান্ত লোক এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্ ছিলেন তাঁর পরিচিতদের অন্যতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াইল্ডকে আকস্মিকভাবে জীবনের সমস্ত আকর্ষণ ছেড়ে অপমানে গঞ্জনায় নির্বাসনে যেতে হল।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিসকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল

'যুবকদের বিপথে চালক' হিসাবে। অস্কার ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধেও সেই অভিযোগ। যৌবনের প্রতি অস্কারের দারুণ আকর্ষণ ছিল। তাঁর সমস্ত লেখায় যৌবনের জয়গান। তাও সেই যৌবন, যা পুরুষের মধ্যে ফুটে ওঠে। তাঁর স্ত্রী ছিল রূপসী, দুটি ছেলেও হয়েছিল, তাঁর দাম্পত্য জীবনে কখনো গণ্ডগোল আসেনি।

আইনের নিপুণতার জন্য ইংল্যাণ্ড বিখ্যাত—কিন্তু সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের বিচারে ইংল্যাণ্ডের আদালত অনেক ক্ষেত্রেই সুরুচির পরিচয় দেয়নি। কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ডের সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় এই যে, তিনি নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন, মামলা তুলেছিলেন তিনিই। অনেক বন্ধু-বান্ধব অস্কারকে মামলা চালাতে বারণ করেছিল—একমাত্র আলফ্রেড ডগলাস ছাড়া। আসলে আলফ্রেডের সঙ্গে তার বাবার যে ঝগড়া, তরুণ পুত্রের সঙ্গে প্রৌঢ় পিতার, অস্কারের এর মধ্যে পড়ে গিয়েই বেশী মুসকিল হল।

আলফ্রেড ডগলাস সুঠামকান্তি যুবা, অস্কারের চেয়ে বছর কুড়ি বয়েসের ছোট। প্রথম আলাপ হয় এক থিয়েটারের হলে। তার পর থেকেই দু'জনে দু'জনের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হয়ে গেলেন। দু'জনে হলেন ছায়ার মতো সঙ্গী। ডগলাস অস্কারকে দেখতেন প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে, কবি হিসেবে, জীবনের আদর্শ হিসেবে। তাঁর তরুণ মনে অস্কার ছিলেন ঈশ্বরের মতো প্রিয়। আর ডগলাসের মধ্যে অস্কার হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন নিজের ফেলে আসা যৌবন, চিরন্তন যৌবন। কিন্তু দু'জন পুরুষের এমন ঘনিষ্ঠতা অপরের সহ্য হয় নি।

মামলা ঠুকে দিয়ে হাল্কা মনে অস্কার ওয়াইল্ড ডগলাসকে নিয়ে মন্টিকার্লোতে বেড়াতে চলে গেলেন। আর কুইনসবেরি নানান লোক লাগিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলেন তাঁর বিরুদ্ধে। অত্যন্ত নিচু জাতের বারবনিতাদের ধরে ধরে সাক্ষী দেবার জন্য তৈরী করা হতে লাগলো। কুইনসবেরির পক্ষে উকিল হলো এডোয়ার্ড কার্সন—যে ছিল অস্কারের কলেজে পড়া বন্ধু। অস্কারের পক্ষে সৎ এবং মহৎ আইনজ্ঞ এডোয়ার্ড ক্লার্ক।

অস্কার নিশ্চিত ছিলেন তাঁর জয় সম্বন্ধে। বিপক্ষের উকিল কি আর প্রমাণ দেবে—ডগলাসকে লেখা কিছু চিঠি আর 'পিক্‌চার অব ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের অংশ বিশেষ। কিন্তু এ তো সাহিত্য—তার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কি সম্পর্ক? মামলা আরম্ভ হলো ১৮৯৫-এর ৩রা এপ্রিল। কিন্তু তিনদিন মামলা চালাবার পরই দেখা গেল আবহাওয়ার পাখি

ক্যুইনসবেরির দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে ওরা জোগাড় করেছে টেলার নামে এক ছোকরাকে—যে ফ্ল্যাট ভাড়া দিত। এদিকে মামলার বিবরণ পড়ে জনগণ ক্ষেপে গেছে। ওয়াইল্ড হয়ে উঠলেন লণ্ডনের কুখ্যাততম ব্যক্তি। ওয়াইল্ডের সপক্ষে উকিল ক্লার্ক তাঁকে সুপরামর্শ দিলেন মামলা তুলে নিতে। অভিযোগ সংবরণ করা হল। ক্যুইনসবেরি সগর্বে কোর্ট থেকে বেরিয়ে জনতার সংবর্ধনা পেলেন। সমস্ত বন্ধুবান্ধব ওয়াইল্ডকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন, ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যেতে। মামলা তুলে নিলেও এর পরিণতি অনেক দূর গড়াবে, তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের জনতার কাছে ওয়াইল্ডের স্থান নেই। পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালোবাসা, এ কেউ মানবে না, ধিক্কার দেবে! কিন্তু ওয়াইল্ড কিছুতেই দেশ ছাড়তে চাইলেন না।

চুপ করে বসে বসে মদ্যপান করতে লাগলেন। ক্যুইনসবেরি সমস্ত প্রমাণ, সাক্ষ্যগুলো পাঠিয়ে দিলেন পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে। সরকার পক্ষ থেকে ওয়াইল্ডকে কয়েকদিন পরেই গ্রেপ্তার করা হল। কোন জামিন দেওয়া হল না। এই সময় সমস্ত পাওনাদাররা ওয়াইল্ডের যাবতীয় সম্পত্তি নীলাম করে নিল, উত্তেজিত জনতা তাঁর ঘরের জানালা-দরজা ভেঙে সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিস, এবং পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেললো, প্রকাশকরা তাঁর বই ছাপতে রাজী হল না আর। এমন কি ওয়াইল্ডের সুন্দর নিষ্পাপ ছেলে দুটিকে তাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল বাবার অপরাধে।

"Love that dare not speak its name"—সেই ভালোবাসা যা নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পায়, নবীন যুবার প্রতি নিঃশেষিত-যৌবন পুরুষের ভালোবাসা,—সেই ভালোবাসা—যা ছিল ডেভিড আর জোনাথানের মধ্যে, যা আছে প্লেটোর দর্শনে, মাইকেল এঞ্জেলো শেকসপীয়ারের সনেটে—ইংল্যাণ্ডের আইনে তা নিষিদ্ধ, পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে এমন আইন নেই। এই আইনে ওয়াইল্ডের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। বিচারপতির রায় শুনে জনতা উল্লাসে নৃত্য করতে লাগলো—একজন অভিজাত পুরুষের পতনে।

দু'বছরের কারাদণ্ড হয়তো খুব বেশী নয়, কিন্তু এর অপমানে ওয়াইল্ডের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। ওয়াইল্ড ছিলেন উঁচু সমাজের মুকুটমণি। যেকোনো আসরে তিনিই থাকতেন একমাত্র বক্তা। সুন্দর নারী পুরুষেরা ঘিরে থাকতো তাঁকে সব সময়। প্রতিভার অহংকারে সবসময় ঝকমক করতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কথা বলার সাহস ছিল না কারুর। সেই

ওয়াইল্ড নির্জন কারাকক্ষে একা। কথা বলার কোনো লোক নেই! কারাগৃহে প্রবেশের কিছুদিন পর থেকেই লেখক ওয়াইল্ডের মৃত্যু। তারপর শুধু দুর্বিষহ বেঁচে থাকা। আদালতে জবানবন্দীর সময়ও উপস্থিত প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান লোক স্বীকার করেছে—ওয়াইল্ডের প্রতিটি উত্তর নিপুণ সাহিত্যে রসযুক্ত। বিচারকদের নিয়ে তিনি খেলা করেছেন। বিপক্ষের উকিল পুরোনো বন্ধু কার্সন তাঁকে একটুও দয়া বা সম্ভ্রম করেন নি। ওয়াইল্ডের আদালতের জবানবন্দী বিশ্ববিখ্যাত—তার কিছু নমুনা দেওয়া হল!

কার্সন: আপনার ডোরিয়ান গ্রে'-র ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'এমন কোন বই নেই যা নৈতিক অথবা দুর্নৈতিক। কোন গ্রন্থ হয় সুলিখিত অথবা সুলিখিত নয়। এই পর্যন্ত!' এই কি আপনার মতামত?

ওয়াইল্ড: হ্যাঁ, আমার শিল্প সম্বন্ধে মতামত।

কার্সন: তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, কোন বই যতই দূষিত নীতিতে ভর্তি থাক সুলিখিত হলেই আপনার মতে তা ভাল বই?

ওয়াইল্ড: নিশ্চয়ই! যদি সুলিখিত হয়, যাতে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে—সৌন্দর্যই মানুষের সর্বোচ্চ অনুভূতি! যদি খারাপভাবে লেখা হয়—তাহলে শুধু বিরক্তি আনে।

কার্সন: তাহলে দূষিত নীতি প্রচার করছে এমন বই ভালভাবে লেখা হলেই ভাল বই হতে পারে?

ওয়াইল্ড: কোন শিল্প সৃষ্টিই কখনো কোনো মতামত প্রচার করে না। মতামত থাকে জনগণের মনে, যারা শিল্পী নয়।

কার্সন: বিকৃত রুচিসম্পন্ন উপন্যাসও ভাল বই হতে পারে?

ওয়াইল্ড: 'বিকৃত রুচিসম্পন্ন উপন্যাস' বলতে কি বোঝাচ্ছেন জানি না।

কার্সন: 'ডোরিয়াম গ্রে' উপন্যাসের এরকম ব্যাখ্যা করা যায়।

ওয়াইল্ড: বর্বর এবং অশিক্ষিতদের কাছেই তা মনে হবে। শিল্প সম্বন্ধে অশিক্ষিত লোকদের মন্তব্য ধর্তব্য নয়…

(চিঠি সম্বন্ধে অভিযোগ)

ওয়াইল্ড: আমি মনে করি এটা সুন্দর একটা চিঠি। একটি কবিতা।

কার্সন: কিন্তু শিল্পটুকু বাদ দিলে, মিঃ ওয়াইল্ড?

ওয়াইল্ড: শিল্প বাদ দিয়ে আমার কিছুই বলার নেই।

কার্সন: মনে করুন, শিল্পী নয় এমন কোন লোক যদি এই চিঠি লিখতো, আপনি কি সমর্থন করতেন?

ওয়াইল্ড : যে শিল্পী নয়, তার পক্ষে এ চিঠি লেখাই সম্ভব নয়।

কার্সন : এর মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই। "রক্ত গোলাপ-পাপড়ি ওষ্ঠ তোমার···"

ওয়াইল্ড : সেটা অনেকখানি নির্ভর করে কিভাবে জিনিসটা পড়া হলো।··· আপনি খারাপভাবে পড়েন।

কার্সন : আপনি কি এই ধরনের চিঠি অনেক লিখেছেন ?

ওয়াইল্ড : আমি কখনো এক ধরনের লেখা দুবার লিখিনা !

কার্সন : (আর একটা চিঠি পড়ে) এটা কি সাধারণ চিঠি ?

ওয়াইল্ড : আমি যা লিখি সবই অসাধারণ ! গ্রেট হেভেনস্ ! আমি কখনো সাধারণ হবার চেষ্টা করি না।

কারাগৃহে ওয়াইল্ডের দু'বছরের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে চরম কষ্টে। বন্ধুরা সকলেই তাঁকে ছেড়ে গেছে খবর পেয়েছেন। অর্থাভাব। স্ত্রীর মনঃকষ্ট। সন্তানদের দেখার ইচ্ছে। না লেখার যন্ত্রণা। কারাগারে তিনি আলফ্রেড ডগলাসকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন সেটাই 'দি প্রোফাউণ্ডিস' নামে ছাপা হয়। সেই তাঁর একমাত্র গম্ভীর গদ্য রচনা। জেলে বসেই লেখা 'দি ব্যালাড অফ রিডিং গ্যাওল' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং ইংরেজী ভাষায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতায় তাঁর কারাবাসের দুঃখিত জীবনের মর্মস্পর্শী ছবি ফুটে উঠেছে। কারাগারে বালক কয়েদীদের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন নি। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে কয়েকজন বালক কয়েদীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অন্য কয়েদীদেরও জেলের পরবর্তী জীবনে সাহায্য করতে চেয়েছেন।

ওয়াইল্ডের জীবন হলো একদিক থেকে মর্মান্তিক যখন তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন। অস্কার ওয়াইল্ডের কোন স্থান নেই ইহলোকে। এক সময় তাঁর বই ছিল, যাকে বলে বেস্ট সেলার। কিন্তু বদনামের ভয়ে প্রকাশকরা তাঁর বই ছাপা বন্ধ করে দিল। তাঁর নাটক অভিনয়ের সময় লণ্ডনে হৈ-হৈ পড়ে যেতো—সবকটা থিয়েটারে তবু তাঁর নাটক বন্ধ। 'লেডি উইণ্ডারমেয়ার'স ফ্যান' কিংবা 'ইম্পর্টেন্স অব বিয়িং আর্নেস্ট' এর জনপ্রিয়তা ছিল কল্পনাতীত। মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে সেই লেখক হয়ে গেলেন অবজ্ঞাত, ঘৃণ্য। অস্কার ওয়াইল্ড নাম শুনলে কেউ বাড়িতে ঢুকতে দেয় না, হোটেলে জায়গা হয় না—কারণ তিনি যৌন ব্যভিচারের দোষে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। যে কোন হোটেল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। ছদ্ম নাম নিয়ে এক হোটেল

থেকে অন্য হোটেলে ঘুরতে লাগলেন—চেনাশুনা লোকদের এড়িয়ে। চেনাশুনা লোকরাও তাঁকে দেখলে এড়িয়ে যেত। অবশ্য ওয়াইল্ড এ নিয়ে বিশেষ দুঃখ কখনো প্রকাশ করেন নি। "শিল্পী হিসেবে আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি—এখন আমার প্রয়োজন খুব কম—বেঁচে থাকার মতো সামান্য অর্থ এবং লেখা।" কিন্তু লেখার জগৎ তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিল। লেখা সম্বন্ধে নানান কথা বলতেন কিন্তু লেখা হত না। তাঁর কাছ থেকে প্লট নিয়ে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নাটক লিখে অনেক টাকা করেছেন। কিন্তু নিজে কিছু লিখতে পারছেন না। ওয়াইল্ডের বয়স তখন মাত্র তেতাল্লিশ।

কবি ইয়েটস্ তাঁর আত্মজীবনীতে এই সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে ওয়াইল্ডকে আনন্দ দেবার জন্য বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর দু'একজন বন্ধু তাঁকে এক পতিতালয়ে নিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু অস্কার একদম উপভোগ করতে পারেন নি—তাঁর কাছে মেয়েদের মনে হয়েছিল 'ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংসের মত।' সারাজীবনে আর কখনো ওয়াইল্ডের মেয়েদের প্রতি আসক্তি জন্মায় নি। আলফ্রেড ডগলাসের সঙ্গেও কিছুদিন কাটিয়েছেন—যদিও স্ত্রীর কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন এই শর্তে যে, ডগলাসের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। ওয়াইল্ড শেষ জীবনে বুঝতে পেরেছিলেন, আলফ্রেডই তাঁর জীবনের শনি গ্রহ—আলফ্রেডের সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর জীবনে অন্যরকম হতো। কেমন দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল তাঁর সাতচল্লিশ বছরের জীবন।

প্যারিসের সস্তা রেস্তোরাঁয় ওয়াইল্ডের দিন কাটে। পরের অনুগ্রহে ও করুণায় খরচ চলে। যেন প্রচণ্ড অপমান তাঁর শরীর ও মন দুমড়ে দিয়েছে। যিনি অসাধারণ জাঁকজমকের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন—আজ তাঁর সম্পূর্ণ উল্টো দশা। ভয়ংকর রকম নিঃসঙ্গ। জীবিত অবস্থাতেই এমনভাবে এত দ্রুত অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত হবার ইতিহাস অস্কারের মতো আর কোনো লেখকের নেই। মাঝে মাঝে ফরাসী তরুণ লেখকদের মধ্যে বসে নানান গল্প করেন। সঙ্গে মারাত্মক পানীয় আবসাঁথ। শরীরের রূপ নষ্ট হয়ে গেছে। শরীর সুস্থ অথচ কিছু লিখতে পারছেন না—এমন লেখকের গভীর দুঃখ ভাষায় বোঝান যায় না!

একদিন ওয়াইল্ড তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমি মৃত লোকদের সঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছি।' তাঁর মুখ বিমর্ষ। তার কয়েকদিন আগেই তাঁর কানে অসহ্য ব্যথা হয়েছিল। একবার অপারেশানেও সারলো

না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা ছিল, সম্ভবত তার একটি কারণ সিফিলিস। শেষ দিনে তিনি সমাগত কতিপয় বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, জ্ঞান আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ-চমকের মত বক্তা ওয়াইল্ড সে দিন বাক্‌শক্তিহীন। যেন প্রচণ্ড অভিমানেই তিনি কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলছেন না। সেই দেবকান্তি রূপ আর নেই, স্থূল এবং কুদর্শন হয়ে পড়েছেন—তবু সরল বড় বড় চোখ দুটি খোলা। ১৯০০ সালের তিরিশে নভেম্বর বেলা একটার সময় একটা খুব বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ওয়াইল্ড পৃথিবী ছাড়লেন। বিংশ শতাব্দীতে আর তাঁর পা দেওয়া হলো না। সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে এসেছিলেন, সময়ের আগেই চলে গেলেন।